আদর্শ এক গৃহবধূ

আব্দুল খালেক জোয়ারদার

কাবা প্রকাশনী
৩/ক পুরানা পল্টন ঢাকা-১০০০

প্রকাশন
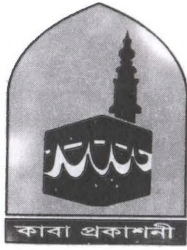
কাবা প্রকাশনী
৩/ক পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।
ফোন ঃ ৭১৭০৫৮৪, ০১৮-২১২৬৭৫
০১৭২-০২০৯৭৮, ০১৭২-১১৬৮৯৫

প্রকাশ কাল ঃ ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০০৩ইং
৩১ ভাদ্র, ১৪১০ বাংলা
১৮ রজব, ১৪২৪ হিজরী

প্রচ্ছদ ঃ বশির মিসবাহ
রিটু. (সালসাবীল)

অক্ষর বিন্যাস ঃ কাবা কম্পিউটার সার্ভিস

মুদ্রণ ঃ মনিরামপুর প্রিন্টিং প্রেস
নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০।

মূল্য ঃ ৫০/- (সাদা)
৭০/- (অফসেট)

ADARSHA AAK GREEHA BADHU
BY : ABDUL KHALEQUE JOARDAR

।। উৎসর্গ ।।

যাঁদের অসিলায় আল্লাহ পাক আমাকে
দুনিয়ার আলো দেখিয়েছেন,
সেই জান্নাতবাসী আব্বা ও আম্মার
পবিত্র রুহের উদ্দেশ্যে-
হে আল্লাহ, তুমি তাঁদের জান্নাত নসিব কর।

হতভাগ্য সন্তান
আব্দুল খালেক জোয়ারদার

দু'টি কথা

আব্দুল খালেক জোয়ারদারকে আমি জানতাম ও চিনতাম কবি হিসাবে। পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি। আমি তখন কারমাইকেল কলেজের ছাত্র। কবিতার ভূত তখন ঘাড়ে। অধ্যাপক কবি মুফাখ্খারুল ইসলামের বাসায় পরিচয়। সেকি আন্তরিকতা। কতদিন তাঁর স্টেশন রোডের বাসায় ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দিয়েছি– সাহিত্য, কাব্য, নাটক, উপন্যাসের আলোচনায়। সবচেয়ে বৈচিত্রপূর্ণ ছিল তাঁর জীবন কাহিনী। শুনতে শুনতে কোথা দিয়ে যে সময় চলে যেতো...।

সেই কবি আব্দুল খালেক জোয়ারদার উপন্যাস লিখেছেন। জানতে পেলাম উপন্যাস লিখে তিনি ইতিমধ্যে স্বর্ণপদকে ভূষিত হয়েছেন। গর্বে বুক ভরে গেছে। গুণী তার যথার্থ কদর পেয়েছেন।
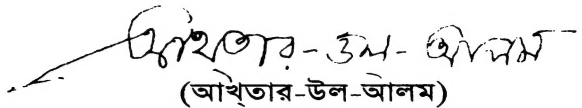
'আদর্শ এক গৃহবধু' কবি আব্দুল খালেক জোয়ারদারের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস। একজন উপন্যাসিক যদি এর ভূমিকা লিখতেন, ভাল হত। কিন্তু সুদূর রংপুর থেকে চিঠি লিখেছেন। অনুরোধ নয়, দাবী জানিয়েছেন। দু'কথা লিখে দিতেই হবে। এ দাবী জানাবার অধিকার তাঁর আছে। আমি তাঁর গুণমুগ্ধ। তাঁর উপন্যাসের বিচার বিশ্লেষণ আমার দ্বারা না হওয়াই ভাল। পাঠক-পাঠিকারা পড়ে নিয়ে নিজের থেকেই বিচার করবেন। সেটাই হবে সর্বোত্তম।

সুদূর মফঃস্বলে থেকে ব্যস্ত জীবনের ফাঁকে ফাঁকে সাহিত্য চর্চা করে যারা সাহিত্যের ধারা জিইয়ে রেখেছেন, কবি আব্দুল খালেক জোয়ারদার তাদেরই একজন। সুদূর আসমানে মিটিমিটি তারা জ্বলে। দূর থেকে তাই দেখি। কিন্তু এর এক একটা নাকি সূর্যের চেয়েও বড়। যারা বিজ্ঞানী তারা জানেন। জোয়ারদার দূর থেকে তেমনি এক মিটিমিটি তারকা। কিন্তু তাঁর আদর্শের আলোক– সূর্যালোকের মতই সৃষ্টিধর্মী। এই উপন্যাস তার বড় প্রমাণ।

আজ আমাদের জীবনসূর্য মধ্যাহ্ন গগন থেকে হেলে পড়েছে। চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে ব্যবধান হয়ত দুস্তর। কিন্তু খালেক জোয়ারদারের মত লোকেরা চাওয়া-পাওয়ার ধার ধারেন না। তারা শুধু দিয়েই যান। দেশকে, জাতিকে, সমাজকে। 'আদর্শ এক গৃহবধু'র মাধ্যমে খালেক জোয়ারদার সমাজকে যা দিয়েছেন বা দিতে চেয়েছেন, সবাই যে তা সাদরে গ্রহণ করবেন, এমনটি না ভাবাই ভাল। কিন্তু যারা তাঁর অবদানকে গ্রহণ করবেন, তারা তা গ্রহণ করবেন মনে প্রাণে। অন্তরের অন্তস্থলে সে অবদানকে রেখে দেবেন, মনি দ্বীপের মত তা জ্বলবে চিরকাল। চির অনির্বান সেই দ্বীপ শিখায় গ্রহীতারা সাজিয়ে নেবেন নিজ জীবন– জীবনের যাত্রাপথ। খালেক জোয়ারদারের সাহিত্য সৃষ্টি সেখানেই খুঁজে নেবে তাঁর স্বার্থকতা।

আমি আগ্রহ নিয়ে 'আদর্শ এক গৃহবধু' পড়েছি। কেমন লেগেছে, তা বলতে চাই না। কারণ যারা এই উপন্যাস পড়বেন, আগে ভাগে কিছু বললে তাদের রসভঙ্গ হতে পারে। বেরসিকের মতই তাই এ বিষয়টা এড়িয়ে গেলাম। আমি আশা করব কোন না কোন প্রকাশক এগিয়ে আসবেন। খালেক জোয়ারদারের অপরাপর উপন্যাস/কবিতা/নাটক/প্রবন্ধ/নিবন্ধ পুস্তকাকারে প্রকাশ করে বাংলার সাহিত্য ভান্ডার সমৃদ্ধ করবেন। খালেক জোয়ারদারের গুণমুগ্ধ বন্ধু হিসাবে দেশের প্রকাশক সমাজের কাছে এটাই আমার একমাত্র চাওয়া।

ইতি, ২২ আগষ্ট, ০৩ইং।

আখ্তার-উল-আলম

(আখ্তার-উল-আলম)
সাবেক রাষ্ট্রদূত
উপদেষ্টা সম্পাদক
দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা।

লেখকের কথা

যে জাতির সাহিত্য-সংস্কৃতি যত মার্জিত ও উন্নত সে জাতি তত সভ্যতার দাবীদার। বর্তমান আধুনিক বিশ্বে মানুষ শিক্ষা-দীক্ষায় যত বেশী উন্নত হচ্ছে, সভ্যতার গন্ডি থেকে ততই দূরে ছিটকে পড়ছে। ইসলাম একটি স্বতন্ত্র ধর্ম। মুসলমানরা একটি স্বতন্ত্র জাতি। এই জাতির কৃষ্টি-কালচার ও সংস্কৃতিও স্বতন্ত্র এবং সে সংস্কৃতি প্রেরিত হয়েছে উর্ধ্বাকাশ থেকে সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক। কিন্তু বর্তমানে অপসংস্কৃতির সয়লাবে সেই স্বতন্ত্র নির্ভেজাল সংস্কৃতি বিলুপ্তির পথে। এই বিলুপ্তির কারণ হলো– কৃষ্টি-কালচার ও সংস্কৃতি প্রসার লাভ করে থাকে প্রচারের মাধ্যমে। আর এই প্রচার মাধ্যমের সঙ্গে জড়িত থেকে মূখ্য ভূমিকা রেখে থাকেন লেখক ও প্রকাশকগণ। তাই দুই সম্প্রদায়ের মনমানসিকতার উপর নির্ভর করে সাহিত্য-সংস্কৃতির উন্নতি ও অবনতি। কারণ তাদের পরিবেশিত আহার গলাধঃকরণ করে থাকে দেশের যুব সমাজ। তাই লেখক ও প্রকাশক মহোদয়গণ যেরূপ খাদ্য পরিবেশন করবেন যুব সমাজ বা পাঠক তাই আহার করবেন এবং সেভাবেই তাদের স্বাস্থ্য গড়ে উঠবে। বর্তমানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, উলংগ অপসংস্কৃতি এমনভাবে জেকে বসেছে যে, সেখান থেকে যুব সমাজকে ফিরিয়ে আনা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে উপন্যাস সাহিত্য। যে সাহিত্য সবচেয়ে বেশী পঠিত হয়ে থাকে এবং যার পাঠক অধিকাংশ যুবক-যুবতী। আর যুবক-যুবতীরা বেশী আকৃষ্ট হয়ে থাকে যৌন সুড়সুড়িমূলক সস্তা প্রেম কাহিনীর প্রতি। এটা তাদের দোষ নয়, তাদের বয়সের ধর্ম। তাই দেখা যাচ্ছে মুসলমান ঘরের ছেলে-মেয়েরা ক্রমশঃই নৈতিক চরিত্র হারিয়ে ফেলছে। জরিপ করে দেখা গেছে এর মূলে কাজ করছে উলংগ মিডিয়া ও যৌন সুড়সুড়িমূলক কাব্য উপন্যাস। ষাটের দশকেও এদেশ ছিল অপসংস্কৃতি থেকে মুক্ত। তখনকার কাব্য উপন্যাসগুলো ছিল মার্জিত রুচি সম্পূর্ণ। তারপর দেশ স্বাধীন হবার পর যখন স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি ও বিপক্ষের শক্তি হিসাবে মুসলমানদের দু'টি দলে বিভক্ত করা হলো এবং ঈমানদার ইসলামপ্রেমিক মুসলমানদের মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক আখ্যায় আখ্যায়িত করে বিপক্ষের শক্তি হিসাবে চিহ্নিত করা হলো, তখন ইসলামপন্থী লেখকরা নিক্ষিপ্ত হলেন আস্তাকুঁড়ে। তখনকারইসলামবিদ্বেষী প্রশাসন তাদের প্রচার মাধ্যমগুলোতে ইসলামের পক্ষের লেখকদের লেখা অগ্রহণযোগ্য বলে গণ্য হতে লাগল। যার কারণে এই লেখককেও প্রায় দুই দশক কলম বন্ধ রাখতে হয়েছিল। তখন অধিকাংশ প্রকাশকরাও নিজ স্বার্থ রক্ষার্থে ও অর্থ কামাইয়ের ধান্ধায় সরকারের লেজুড় বৃত্তি করে বামপন্থী লেখকদের উলংগ যৌন সুড়সুড়িমূলক কাব্য উপন্যাস প্রকাশ করে বাজারে ছাড়তে লাগল। ফলে যা হবার তাই হলো, যুব সমাজ মনের নতুন খোরাক পেয়ে ইসলামী তামুদ্দুন তাহজীব থেকে ধীরে ধীরে নিজেদের সরিয়ে নিয়ে অপসংস্কৃতির সাগরে গা ভাসিয়ে চরিত্র ধ্বংস করার ব্রত নিল। যার ফলশ্রুতিতে দেশ আজ এক অরাজকতার গহ্বরে হাবুডুবু খাচ্ছে।

কোন কোন প্রকাশক বলে থাকেন, ***ইসলামী ভাবধারার উপর লেখা উপন্যাস সাহিত্য রস-কসহীন হওয়ায় অধিকাংশ পাঠক তাতে আনন্দ পায় না, আর যে উপন্যাসে আনন্দ বা মনের খোরাক না থাকে সে উপন্যাস আধুনিক সমাজের যুবক-যুবতীরা পড়তে চায় না।*** আমি এই মন্তব্যকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করে উপন্যাস লেখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। ১৯৯৬ সালে ইসলামী ভাবধারার উপর প্রথম উপন্যাস লিখি 'মিনা হাসনার রাত দিন'। উপন্যাসটি ১৯৯৭ সালে ঈদুল আযহা সংখ্যায় সাপ্তাহিক মুসলিম

জাহানে ছাপা হয়। এটা ছাপা হবার পর কয়েকটি স্কুল ও মাদরাসা থেকে প্রশংসাপত্র আসতে থাকে এবং মুসলিম জাহানেও কয়েকটি প্রশংসাপত্র ছাপা হয়। এছাড়া রাজবাড়ী জেলার পাংশা উপজেলার সাহিত্য উন্নয়ন পরিষদ ও বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ কর্তৃপক্ষ যৌথভাবে উপন্যাসখানার উপর আমাকে সংবর্ধনা ও স্বর্ণপদকে ভূষিত করেন। এই উৎসাহে আমি পরপর ১০/১২ উপন্যাস লিখি, তার মধ্যে ৮খানা উপন্যাস ইতিমধ্যেই বিভিন্ন মাসিক ও সাপ্তাহিকে ছাপা হয়েছে এবং বাকীগুলো ছাপার অপেক্ষায় আছে। প্রতিটি উপন্যাসই পাঠক নন্দিত হয়েছে। তবে পুস্তক আকারে 'আদর্শ এক গৃহবধূ'ই প্রথম ছাপা হতে যাচ্ছে। আমার চ্যালেঞ্জ ছিল ইসলামী চেতনায় ধর্মীয় সংস্কৃতি ঠিক রেখে উপন্যাস রচনা করে উলংগ সংস্কৃতির চেয়েও পাঠকের মনের খোরাক অনেক বেশী দেয়া যায়। আমি আমার চ্যালেঞ্জে সফল হয়েছি ইনশাল্লাহ। তবে অর্থাভাবে বই আকারে প্রকাশ করতে না পারায় পাঠকদের খেদমতে পৌঁছাতে সক্ষম হই নাই। সক্ষম হলে অপসংস্কৃতির গন্ডি থেকে যুব সমাজকে ফিরিয়ে আনা অবশ্যই সম্ভব হতো। কারণ যে কোন সাহিত্যই বিশেষ করে নাটক, উপন্যাস বা গল্প হতে হবে বাস্তবধর্মী। তাতে থাকতে হবে দেশের, সমাজের ও মানুষের জীবনের প্রতিচ্ছবি। অবাস্তব গল্প কাহিনী জাতিকে কিছু দিতে সক্ষম নয়। তাই জাতিকে অশ্লীলতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে হলে প্রয়োজন সমপরিমাণ রুচিশীল বাস্তবধর্মী সাহিত্য সৃষ্টি করা। আর এ কাজটি মোটেও কঠিন নয়- যদি ইসলামিক কলাম লেখকরা ধর্মীয় ভাবধারায় পাঠকের মনমানসিকতা উপলব্ধিতে রেখে কাব্য-উপন্যাস লিখতে শুরু করেন এবং প্রকাশকগণ ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে সেগুলো প্রকাশ করেন।

বর্তমান উশৃংখল সমাজকে শৃংখলাবদ্ধ করে নারী জাতিকে আদর্শ মাতা, জায়া ও ভগ্নী রূপে গড়ে তুলতে হলে এই উপন্যাসটি প্রতিটি ঘরে ঘরে মা বোন ও বধূদের হাতে তুলে দিতে হবে। আর সেই লক্ষ্যকে আমলে রেখেই আদর্শ এক গৃহবধূ' উপন্যাসটি মাসিক কাবার পথে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ হওয়াকালিন পাঠকদের দাবীর মুখে 'কাবা প্রকাশনী'র স্বত্বাধিকারী মুফতি সাইফউদ্দীন ইয়াহইয়া ভাই ঘরে ঘরে আদর্শ গৃহবধূ তৈরি করার মানসে উপন্যাসটি প্রকাশের যে সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন এ জন্য তাঁর কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। তিনি উদ্যোগ গ্রহণ না করলে পুস্তক আকারে উপন্যাসটি ছাপা হতো কিনা আল্লাহপাকই ভাল জানেন। উপন্যাসটির পান্ডুলিপি দেখে ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দিয়ে সহযোগিতা করায় লেখক ও কলামিষ্ট স্নেহভাজন ডাঃ মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেবের কাছেও আমি ঋণী হয়ে রইলাম। আর একজন সহৃদয় ব্যক্তি যার উৎসাহ-উদ্দীপনা ও বিভিন্ন সাহায্য সহযোগিতা আমার লেখক জীবনে চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে তিনি হলেন আমার একান্ত শুভাকাঙ্খী বন্ধু দেওয়ান মাসুদার রহমান (জানু) তাঁর কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। পরিশেষে উপন্যাসটি পাঠ করে পাঠক যদি পরিতৃপ্ত হন তাহলে আমার শ্রম স্বার্থক হবে এবং আগামীতে অন্যান্য উপন্যাস প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করব ইনশাআল্লাহ।

বিনীত

আব্দুল খালেক জোয়ারদার

প্রকাশকের কথা

সাহিত্য মানুষের মনের কথা বলে। যার কারণে মানুষ সাহিত্য পাঠ করে মনের খোরাক পায়। বর্তমানে যৌন সুড়-সুড়ি দিয়ে পরকাল বাদ দিয়ে যে সাহিত্য রচনা হচ্ছে তা দ্বারা মানুষ সৃষ্টিকর্তাকে ভুলে ইহজগতের তৃপ্তিবোধ করছে। এর কারণে ঈমান-ইসলামের সাথে এক শ্রেণীর মানুষের দূরত্ব সৃষ্টি হচ্ছে। দ্বীনদার বুদ্ধিজীবিরা এ ধরনের সাহিত্যকে অপসংস্কৃতি হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। আবহমানকাল হতে কৃষ্টি-কালচার, তাহজীব-তমদ্দুন বজায় রেখে সকল ধর্মের সাহিত্যিকগণ বইপুস্তক লিখতেন। যেমন– শরৎ চন্দ্র তার সাহিত্যে ধর্মীয় ও সামাজিক চিত্র তুলে ধর্মমুখী ও নীতিবান বানাতে চেয়েছেন হিন্দু সমাজকে। অন্যদিকে ইসলামী তাহজীব-তমুদ্দুন রক্ষা করে ইসলামী সাহিত্য যারা লিখে সমাজকে ইসলামমুখী করতে আজীবন চেষ্টা করেছেন তাঁদের মধ্যে মুন্সী মেহের উল্লাহ, ইসমাইল হোসেন সিরাজীসহ অনেকের নাম উল্লেখযোগ্য। বর্তমান সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় আদর্শকে জলাঞ্জলী দেয়া হয়েছে বললে অত্যুক্তি হবে না। কারণ রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলাম এখানে পরাজিত শক্তি। ব্যক্তি জীবনে যা চলছে ঈমান-ইসলাম রক্ষার মেহনত। বিশেষ করে তথাকথিত সাহিত্যিকগণ এ সকল আদর্শের ধার ধারেন না। ইসলামী চিন্তা-চেতনায় উজ্জিবিত যে সকল মনীষী সাহিত্যের খেদমত করে আসছেন আবদুল খালেক জোয়ারদার ভাই তাদের মধ্যে অন্যতম। জোয়ারদার ভাইয়ের লেখার সাথে আমি আশির দশকে পরিচিত। যখন আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদরাসা-ই আলিয়াতে পড়ালেখা করি। ১৯৯৩ সনে কাবার পথে প্রকাশনার পর হতেই তার সংগে সম্পর্ক গাঢ় হতে থাকে। অতঃপর ১৯৯৫ সনে রংপুরের এক সুধী সম্মেলনে তার সাথে আমার সাক্ষাৎ ঘটে, সেদিন তিনি তার জীবনের অনেক ভাংগা-গড়ার ঘটনা শুনালে আমার মনে পড়ে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুলের কথা। তেমনি একটি প্রতিভার সাক্ষাৎ পেয়ে এবং তার চমৎকার ব্যবহারে খুবই হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠলো আব্দুল খালেক জোয়ারদার ভাইর সাথে। পরে মাওঃ ডাঃ আব্দুল মালেকের নিকট তার সাহিত্য প্রতিভার ভুয়শী প্রশংসা শুনে আমি জোয়ারদার ভাইয়ের সঙ্গে রংপুরে তার বাড়ীতে সাক্ষাৎ করি। তিনি দুঃখ করে বলেছিলেন, সাইফউদ্দিন ভাই আমি জীবনে হয়ত আমার লেখা একটি গল্প-উপন্যাস দেখে যেতে পারব না। সেদিন হতে আমার একটি প্রচেষ্টা ছিল একজন গুণীজনের মনের বাসনা পূরণের কথা। আদর্শ এক গৃহবধূ আমার হাতে এসে পৌছার পর প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত পাঠ করে সিদ্ধান্ত নিলাম সাহিত্যের ভাষায় ইসলামমুখী করার যে নৈপূণ্যতা জোয়ারদার ভাই দেখিয়েছেন তার দ্বারা আশাকরি বেশকিছু ভাই-বোনেরা সত্যকে উপলব্ধি করে মূলের দিকে ফেরৎ আসবেই। সে মানুষিকতা নিয়ে এ মহতি কাজে আমার উদ্যোগ। আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ জোয়ারদার ভাইর প্রতি সাহিত্য চর্চার জন্য তিনি তাঁর এ উপন্যাসটি নিঃস্বার্থে কাবা প্রকাশনীকে দান করে যে ত্যাগ শিকার করেছেন এ দ্বারাই প্রমাণ করে তিনি জাতির জন্য, ইসলামের জন্য কত দরদী। উপন্যাসটি মুদ্রণে কোন ভুলত্রুটি থাকাই স্বাভাবিক। কোন গুণীজন ত্রুটি ধরে দিলে আমরা কৃতজ্ঞ হবো। উপন্যাসটি পড়ে পাঠক-পাঠিকাদের যৎসামান্য খেদমত হলে তার সিংহভাগের হকদার হবেন ভাই জোয়ারদার। পাঠক-পাঠিকাদের প্রতি আমাদের অনুরোধ, বইখানা পাঠে ভাল লাগলে বাংলার প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌছানোর ব্যপারে আপনারা সহযোগীতা করবেন। অপ-সংস্কৃতির মোকাবেলায় আদর্শ এক গৃহবধূ দ্বারা সুস্থ ও সৃজনশীল সাহিত্যের প্রসার ঘটুক এটাই আমাদের কামনা। আল্লাহ আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করলে আমরা স্বার্থক বলে মনে করব।

সাইফউদ্দিন ইয়াহইয়া
সম্পাদক, **মাসিক কাবার পথে, সাপ্তাহিক ইসলাহ**
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, **কাবা প্রকাশনী**

সংক্ষিপ্ত লেখক পরিচিতি

কবি আব্দুল খালেক জোয়ারদার। জন্ম ঃ বাংলা ১৩৩৯ সনের ১৭ অগ্রহায়ণ মাগুরা জেলার শ্রীপুর থানাধীন সারঙ্গদিয়া গ্রামের জোয়ারদার পরিবারে। জন্মের মাত্র ছ'মাস পর পিতা মৌঃ আহাদ আলী জোয়ারদার, পাঁচ বছর বয়সে স্নেহময়ী মাতা, সাত বছর বয়সে মাতামহী ও আট বছর বয়সে একমাত্র বড় ভাই আব্দুল বারীকে হারিয়ে সর্বহারা ও এতিম কবি অবহেলা আর অযত্নের এক পর্যায়ে ১১ বছর বয়সে চাচাতো বোনের সাথে পাড়ি জমান রেলওয়ে চাকুরে ভগ্নিপতির কর্মস্থল অবিভক্ত ভারতের কাটিহারে। দেশ বিভাগের পর সেখান থেকে চলে আসেন গাইবান্ধার বোনারপাড়া জংশনে। এখান থেকেই বেরিয়ে পড়েন ভাগ্যের অন্বেষণে এবং ফুলছড়ি ঘাটে এক হোটেলে মাসিক তিন টাকা বেতনে বয়-এর চাকুরি গ্রহণ করেন। জন্মের পর ক্রমান্বয়ে স্বজন হারাবার বেদনা ও প্রতিকূল অবস্থায় পাঠশালায় গিয়ে শিক্ষা লাভের সুযোগ তাঁর কখনো হয়নি। ১৬ বছর বয়সে স্বপ্রচেষ্টায় অ আ ক খ অক্ষরের সাথে পরিচিত হয়ে কাজের ফাঁকে ফাঁকে অধ্যয়ন করতে থাকেন। '৫২ সালে রংপুর এসে প্রথমে বইয়ের দোকানে ও পরবর্তীতে উকিল সেরেস্তায় কাজ করার সুবাদে তাঁর সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের পথ কিছুটা উন্মুক্ত হয়। এ সময় সান্নিধ্য লাভ করেন বিখ্যাত সাহিত্যিক গাজী শামসুর রহমান, বিচারপতি ও সাবেক রাষ্ট্রপতি আহসান উদ্দীন চৌধুরীসহ বহু গুণীজনের। তাঁদের প্রেরণা কবিকে আরও উৎসাহিত করে তোলে। '৫৪ সাল থেকেই তাঁর লেখা কবিতা, ছড়া, ছোট গল্প বিভিন্ন পত্রিকায় ছাপা হতে থাকে। '৬০ সালে প্রকাশিত হয় প্রথম কাব্যগ্রন্থ "চাবুক"। তাঁর লেখা "দাদুর মজার গল্প" '৬৮ সালে ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীর জন্য দ্রুত পঠন হিসেবে মনোনীত হয়। '৬৯ সালে ছাপা হয় সামাজিক নাটক "নীরব কান্না"। এ ছাড়া অসংখ্য নাটক রংপুর বেতার ও মঞ্চে মঞ্চস্থ হয়। তার লেখা অসংখ্য ইসলামী গান এখনও রংপুর বেতারে প্রচার হয়ে থাকে। "মিনা হাসনার রাত দিন" উপন্যাসের জন্য তিনি স্বর্ণ পদক লাভ করেন। এছাড়া তাঁর সৃজনশীল সাহিত্যকর্মের জন্য "কবি শেখর" খেতাবসহ বিভিন্ন সংগঠন তাঁকে গুণীজন সংবর্ধনা ও সনদপত্র প্রদান করেছে। তাঁর প্রায় ১০টি উপন্যাস পত্রিকায় প্রকাশের পর বই আকারে ছাপার অপেক্ষায় আছে। "আদর্শ এক গৃহবধূ" সুপাঠকদের পাঠ পিপাসা নিবারণে সহায়ক হবে আশা করি।

বর্তমানে তিনি মাসিক মদীনা, মাসিক মূঈনুল ইসলাম, মাসিক কাবার পথেসহ দেশের প্রায় সব ক'টি মাসিক ও সাপ্তাহিকে নিয়মিত কলাম লিখছেন। বাতিলের আতংক নামে খ্যাত এ সাহিত্যিক স্কুল-পাঠশালা ও ওস্তাদ ব্যতিরেকে আল্লাহর রহমত ও স্বপ্রচেষ্টায় বিদ্যার্জন এবং সাহিত্য সাধনার এক বিরল দৃষ্টান্ত। মহান আল্লাহর দরবারে তাঁর সু-স্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবন কামনা করি। আমিন।

চয়ন (চঞ্চল) মাহমুদ
সাংবাদিক/কলামিষ্ট
রংপুর।

।। এক ।।
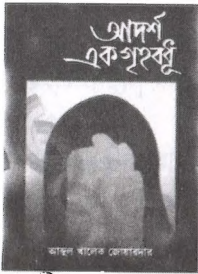
"আস্‌সালাতু খাইরুম মিনান্নাউম।" নিদ্রার চেয়ে নামাজ শ্রেষ্ঠ। আযানের এ শব্দ কানে যাওয়ার সাথে সাথে শাহিদার ঘুম ভেঙ্গে যায়। বিছানায় উঠে বসে পাশের জানালাটা খুলে দেয় শাহিদা। বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখে তখনো গুমোট অন্ধকার বিরাজ করছে। হঠাৎ কিসের যেন একটা শব্দ শুনতে পায় সে। ভয়ে গা শিউরে ওঠে শাহিদার। তাড়াতাড়ি জানালা বন্ধ করে দিয়ে কিছুক্ষণ নিশ্চুপ বসে থাকে বিছানার উপর কান খাড়া করে। না, আর কোন শব্দ শুনতে পায়না সে। ভাবে আর একটু শুয়ে থেকে উঠলেই হবে, এখনো তো অন্ধকারই কাটেনি। পরক্ষণেই চিন্তা করে, না এখন আর ঘুমিয়ে থাকা ঠিক হবে না। এখন ঘুমুলেই ফজরের নামাজ নির্ঘাত ক্বাজা হবে। শয়তান দুনিয়ার ঘুম এনে চোখে চেপে ধরবে। শাহিদা খাট থেকে নেমে ঘরের বাতি জ্বালিয়ে দেয়। তারপর দরজা খুলে বারান্দায় পা রাখে। এমন সময় পাশের রুমের দরজা খুলে বের হয়ে আসেন শাহিদার মা শাহিনা বেগম। তিনি শাহিদাকে দেখে বলেন, আর একটু পরে উঠলেই পারতিস মা! নামাজের এখনো অনেক সময় আছে। অন্য কোন মসজিদে এখনো আযান পড়েনি। আমাদের মসজিদের মুয়াজ্জিন সাহেব সকলের আগে আযান দিয়ে কর্তব্য শেষ করেন। মায়ের কথার জবাবে শাহিদা বলে, ফজরের আযান সময় হাতে রেখে দেওয়াই ভাল। তাতে নামাজীরা ধীরে-সুস্থ্যে আসার সুযোগ পায়, ঐযে আব্বাও উঠে পড়েছেন– বলেই শাহিদা বাথরুমে গিয়ে ঢোকে।

ফজরের নামাজ শেষ করে শাহিদা বসে কোরআন তিলাওয়াতে আর মা শাহিনা বেগম রান্না ঘরে ঢোকেন নাস্তার যোগাড়ে। সকালের নাস্তা শাহিনা বেগমকেই করতে হয়। কারণ কাজের ঠিকা ঝি আটটার আগে আসেনা। ছোট কাজের মেয়ে শিউলীকে দিয়ে থালা-বাসন মাজা, ঘর-দরজা ঝাড় দেয়া ও ফাই ফরমাস চলে মাত্র। খান বাহাদুর রফিক আহমেদের ফজরের নামাজ পড়ে বাসায় ফিরেই চা-নাস্তা করার অভ্যাস অনেক পুরাতন। তাই ফজরের নামাজ শেষ করেই শাহিনা বেগমকে ঢুকতে হয় রান্না ঘরে। খান বাহাদুর রফিক আহমেদের দুই মেয়ে শরিফা ও শাহিদা, এক ছেলে রকিব। শরিফার বিয়ে দিয়েছেন খুলনার ধনাঢ্য শিল্পপতি আতিকুর রহমান চৌধুরীর ছেলে লতিফুর

রহমানের সাথে, আর ছেলে রকিব আহমেদ এম.এ, এল.এল.বি পাস করে এক বছর হলো ঢাকা বারে জয়েন করেছে। এখনো পসার জমে ওঠেনি। আর ছোট মেয়ে শাহিদা বি.এ ক্লাশের ছাত্রী।

খান বাহাদুর রফিক আহমেদের পিতা কফিল আহমেদ ছিলেন একজন প্রভাবশালী জমিদার। বৃটিশ সরকার এই খান বাহাদুর উপাধি জমিদার কফিল আহমেদকেই দিয়েছিল। পিতার মৃত্যুর পর পুত্র রফিক আহমেদ এ উপাধি ওয়ারিশ সূত্রে প্রাপ্ত হন। তারপর জমিদারী চলে যাবার পর খান বাহাদুর রফিক আহমেদ ঢাকায় চলে আসেন এবং ব্যবসা গড়ে তোলেন। পৈত্রিক বাড়ি-ভিটা ছাড়া গ্রামে আর জমাজমি রাখেন নাই দেখাশোনার লোকের অভাবে। সব জমি বিক্রি করে তিনি ব্যবসার দিকে মন দেন। এখন ঢাকায় তাঁর তিনখানা বাড়ি। একখানা দোতলা বাড়িতে তিনি সপরিবারে বসবাস করছেন। আর দু-খানা বাড়ি ভাড়া দিয়েছেন। খান বাহাদুর সাহেবের ইচ্ছা ছিল ছেলে রকিবকে তিনি ব্যবসায় ঢুকিয়ে নিজে অবসর নেবেন। কিন্তু রকিব কিছুতেই ব্যবসার ঝামেলা মাথায় নিতে রাজি হয় নাই। খান বাহাদুর সাহেব ব্যবসার পরিধি ছোট করে আনলেও, কয়েকখানা দূরপাল্লার বাস, তিনটি ট্রাক, একটি পেট্রোল পাম্প ও দুটি কোল্ড স্টোরেজ এখনো আছে। এগুলো আগে খান বাহাদুর সাহেব নিজেই দেখাশোনা করতেন। কিন্তু বয়স হয়ে যাওয়ায় তিনি একজন বিশ্বস্ত লোক খুঁজতে থাকেন। একদিন স্ত্রী শাহিনা বেগম স্বামীকে বললেন, তুমি লোক খুঁজে ফিরছ, অথচ আমাদের ঘরেই লোক আছে। স্ত্রীর কথায় খান বাহাদুর সাহেব থ মেরে স্ত্রীর মুখের দিকে স্বপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন। শাহিনা বেগম স্বামীর দৃষ্টির অর্থ বুঝতে পেরে মৃদু হেসে বললেন, ঘরের লোক দেখতে পাচ্ছ না, তাই না? হ্যাঁ– মানে তুমি কার কথা বলছ, আমি ঠিক অনুমান করতে পারছিনা, বললেন খান বাহাদুর সাহেব। শাহিনা বেগম বললেন, আমাদের মেহেদী হাসান এম.এ পরীক্ষা দিয়ে এখন বাড়িতেই বসে আছে। সবদিক দিয়েই হাসান ভাল ছেলে। কমার্সের ছাত্র ছিল। হিসাবপত্রও ভাল বুঝবে। তাছাড়া ছেলেটার স্বভাব-চরিত্রও খুবই ভাল। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে। স্ত্রীর কথা শুনে খান বাহাদুর সাহেবের চোখে-মুখে খুশীর আভা ফুটে উঠল। তিনি বললেন, শরিফার মা, আমার ইচ্ছা হচ্ছে এই মুহূর্তে তোমাকে একটা মূল্যবান পুরস্কারে ভূষিত করি। কিন্তু হাতের কাছে তেমন কিছু নেই, তবে পাওনা থাকল। সত্যি রত্ন ঘরে রেখে আমি মাঠে-ময়দানে খুঁজে ফিরছি। কিন্তু কথা হলো, হাসান কি

এত উচ্চ শিক্ষিত হয়ে প্রাইভেট ফার্মে আসবে চাকরি করতে?
খান বাহাদুরের কথায় শাহিনা বেগম আশ্বাস দিয়ে বললেন, আসবে। দুলাভাই মারা যাবার পর ওদের অবস্থা এখন ভাল না। বড় আপা কিছুদিন আগে আমাকে বলেছিলেন, সংসার চালাতে আমাকে হিমশিম খেতে হচ্ছে। একমাত্র ভরসা হাসান। হাসান পাস করে বের হয়ে কোন চাকরি না করা পর্যন্ত আমি স্বস্তি পাচ্ছি না। তাই আমার ধারণা বড় আপাকে বললে-- না করবে না। সরকারী চাকরি পাওয়াতো সোনার হরিণ ধরার সামিল। শুনেছি একটা কেরানির চাকরি নিতে গেলেও নাকি লাখ টাকা ঘুষ দিতে হয়। অথচ আপার সে ক্ষমতা নেই। তুমি যদি রাজি থাক আমি আপাকে খবর পাঠাই। স্ত্রীর কথায় খান বাহাদুর সাহেব বললেন, বলো কি– রাজি থাকব না মানে? অমন একটা উপযুক্ত অফার, তাছাড়া সেতো আমাদেরই ছেলে। নিজের বাড়ির মতই থাকবে। উঃ! তুমি আমাকে বিরাট চিন্তার হাত থেকে বাঁচালে। আজই খবর পাঠাও আমি একা আর সামাল দিতে পারছিনা। ভেবেছিলাম রকিবকেই সব বুঝিয়ে দেব; কিন্তু সে কিছুতেই ব্যবসায় আসতে রাজি হলো না, ঢুকল ওকালতি করতে।

করুক না কিছু দিন। তারপর বিয়ে সাদী হলে আপনাতেই মত বদলাবে। তুমি বরং ওর বিয়ের ব্যবস্থা কর। স্বামীকে উদ্দেশ্য করে বললেন শাহিনা বেগম।

এ ঘটনা এক বছর আগের। এখন খান বাহাদুর তার ব্যবসার সমস্ত দায়িত্ব মেহেদী হাসানের হাতে সপে দিয়ে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন। মেহেদী হাসানও বিজ্ঞতার সাথে তার দায়িত্ব পালন করে খালা ও খালুর সুদৃষ্টি অর্জন করে অত্যন্ত আদর-যত্নে দিন কাটাচ্ছে। খান বাহাদুর সাহেব মেহেদী হাসানকে দশ হাজার টাকা বেতন ছাড়াও খাওয়া-পরা সব খরচই বহন করে থাকেন। যার কারণে মেহেদী হাসানের মায়ের সংসারেও আর অভাব নেই। তবে মেহেদী হাসানকে প্রায়ই বাইরে থাকতে হয়। খান বাহাদুর সাহেবের দু'টি কোল্ড স্টোরেজ-ই বাইরে, একটা গাজীপুর ও আর একটা নারায়ণগঞ্জ। সিজন টাইমে প্রায়ই হাসানকে দু'টি কোল্ড স্টোরেজের তত্ত্বাবধানে গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জে দৌড়াদৌড়ি করতে হয়। তাছাড়া বাস ও ট্রাকের দেখাশোনাও তাকেই করতে হয়। যদিও সহযোগী আরো অনেক লোকই আছে, কিন্তু নির্বাহী ক্ষমতা সবই মেহেদী হাসানের হাতে। তাই সব জায়গায়ই তার উপস্থিতির

দরকার হয়। মেহেদী হাসান আসার পরে খান বাহাদুর আরো একখানা গাড়ী কিনেছেন। আগের গাড়ীখানা ছেলে রকিব নিয়ে কোর্টে যায়, যার কারণে মেহেদী হাসানের জন্য আর একখানা গাড়ী কিনতে হয় তাঁকে।
শাহিদার বি.এ পরীক্ষা সামনে। শাহিনা বেগম একদিন মেহেদী হাসানকে বললেন– বাবা হাসান, শাহিদার সামনে পরীক্ষা। তুমি সময় করে ওকে যদি পড়ার ব্যাপারে কিছু সময় সাহায্য করতে তাহলে ওর খুব উপকার হতো। তোমার খালু বাইরের মাস্টার রেখে পড়াতে মোটেও রাজি নয়। তাছাড়া তোমার খালুতো ওকে আর পড়াতেই চাচ্ছে না। বলছেন, বি.এ পরীক্ষা হলেই মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দিবেন। মেহেদী হাসান আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করে– কেন খালাম্মা, শাহিদাকে আর পড়াবেন না কেন?

তোমার খালু বলেন, ভার্সিটিতে এখন আর লেখাপড়ার পরিবেশ নেই। ভার্সিটি হলে মেয়েরা নাকি গাঁজার আসর বসায়। ভার্সিটির ছেলেরা নাকি মেয়েদের সম্মান রক্ষা করে চলে না। শিক্ষাঙ্গনগুলো এখন রাজনীতির আখড়ায় পরিণত হয়ে পড়েছে। ওখানে ছেলে-মেয়েরা যায় শিক্ষা গ্রহণ করতে, কিন্তু বের হয়ে আসে সন্ত্রাসী হয়ে।
খালুজান একেবারে মিথ্যা বলেননি। দেশের রাজনৈতিক দলগুলো ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যবহার করছে হাতিয়ার হিসেবে। ভার্সিটির খুব কম ছাত্র-ছাত্রী আছে– যারা কোন রাজনৈতিক দলের ক্যাডার নয়। নতুন কোন ছাত্র-ছাত্রী যখন ভর্তি হয় তখন থেকেই শুরু হয় রাজনৈতিক দলের টানাটানি। বিভিন্ন টোপ দিয়ে তাদের দলে টানা হয়। আমি অনেক কষ্টে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু সবাই পারে না ওদের হাত থেকে বেঁচে থাকতে।
- আচ্ছা, যে সব নেতা-নেত্রীরা ছাত্রদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নষ্ট করছে, তাদের কি ছেলে-সন্তান নেই?
- আছে। তাদের অধিকাংশের ছেলে-মেয়েরাই লেখাপড়া করে বিদেশে। আর দেশে যারা আছে তারা সব চেয়ে বেশী বেপরোয়া। নেতা-নেত্রীদের ছেলে-মেয়ে হওয়ার কারণে তাদের দাপটে সাধারণ ছেলে-মেয়েরা মুখ খুলতে পারে না। ইচ্ছা না থাকলেও দলে নাম লেখাতে হয়। যখন কোন গন্ডগোলের সৃষ্টি হয় তখন ঐ নিরীহ ছাত্রদের সামনে ঠেলে দিয়ে নিজেরা থাকে পিছনে। যার ফলে দেখা যায় যারা আহত-নিহত হচ্ছে তারা সকলেই বাইরের, নেতা-নেত্রীদের ছেলে-মেয়ে একটিও নেই সেখানে।

তুমি ঠিকই বলেছ বাবা। আমিও সেজন্যই তোমার খালুর মতের বিরোধীতা করিনি। আল্লাহ আল্লাহ করে বি.এ পাস করতে পারলেই ওর পড়া বন্ধ করে দিতে চাই। অবশ্য তাতে শাহিদা রাজি হবে কিনা বলা মুশকিল।

-সেটা তখন দেখা যাবে। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিলেই হবে।

হ্যাঁ, তাই। আগে বি.এটা তো পাস করুক। তাহলে বাবা-

ঠিক আছে, আমি আজ সন্ধ্যায়ই বসব ওকে নিয়ে।

ঐদিনই মাগরিবের নামাজের পর মেহেদী হাসান গিয়ে ঢুকল শাহিদার পড়ার ঘরে। ওরা দু'জন খালাত ভাই-বোন। ছোট বেলায় একই সাথে খেলাধুলা করে বড় হয়েছে। তারপর মেহেদী হাসান কলেজ ছেড়ে যখন ভার্সিটিতে ভর্তি হয় তখন থেকে প্রায় পাঁচ-ছয় বছর আসা-যাওয়া না থাকায় দেখা সাক্ষাৎও হয়ে ওঠে নাই। তবে রকিবের সাথে হাসানের প্রায়ই ভার্সিটিতে দেখা হতো। রকিব ও হাসান দু'জনই সম বয়সী, সম্পর্কও মধুর।

হাসান যখন শাহিদার ঘরে ঢোকে তখন শাহিদা ঘরে ছিল না। হাসান একটি চেয়ারে বসে টেবিলে রাখা বইগুলো নাড়াচাড়া করে দেখছিল। এর কিছুক্ষণ পরেই একটি ট্রেতে কিছু নাস্তা ও চা নিয়ে শাহিদা দরজায় এসে হাসানকে সালাম দিয়ে ঘরে ঢুকল। হাসান পাঁচ-ছয় বছর পর এই প্রথম শাহিদাকে এত কাছ থেকে দেখে অবাক হলো। অতীতের শাহিদাকে যেন আজকের শাহিদার সাথে কিছুতেই মিলাতে পারছিল না। যদিও এ বাড়ীতে আসার পর হাসানকে ব্যবসায়ী ঝামেলায় প্রায়ই খান বাহাদুরের সাথে বাইরে বাইরে থাকতে হয়েছে ব্যবসা বুঝে নিতে, তবু যে মাঝে মধ্যে অন্দর মহলে আসে নাই তা নয়। তবে হাসান অত্যন্ত লাজুক প্রকৃতির হওয়ায় মাথা তুলে কারো দিকে যেমন তাকাত না, তেমনি বিনা প্রয়োজনে কথাও বলত না। তাছাড়া রক্ষণশীল পরিবার হিসেবে বেপর্দায় চলাফেরার উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা থাকার কারণে খোলাখুলিভাবে শাহিদার সাথে কথা বলা বা দেখা-সাক্ষাতেরও তেমন সুযোগ ছিল না। হাসানেরও ওর সম্বন্ধে কোন কৌতূহল জাগেনি কোন দিন। তাই আজ যখন চা-নাস্তার ট্রে হাতে শাহিদা একেবারে সামনে এসে দাঁড়ালো তখন হাসানের মনে হলো; এ মেয়েকে যেন সে কোন দিনই দেখেনি। এই বুঝি প্রথম দেখল। সাদা সালোয়ার কামিজের সাথে মাথায় সাদা উড়নায় অপূর্ব সুন্দর দেখাচ্ছিল তাকে। একেতো দুধে আলতা গায়ের রং, তার উপর হাতে কালো রেশমির চুড়ি ও কানে সাদা পাথর বসান সোনার টপ, কাজল দেয়া দু'টি টানা

টানা চোখ যেন কল্পনার সেই ফুলপরীর কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল সারা অঙ্গ থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল এক নির্মল স্বর্গীয় জ্যোতি। হাসান তখনও তাকিয়েছিল শাহিদার দিকে। শাহিদা টেবিলে নাস্তার ট্রে রেখে হাসানের দিকে তাকিয়ে ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির রেখা টেনে বলল, ভাইজান! চা ঠান্ডা হচ্ছে, কি দেখছেন অমন করে? শাহিদার কথায় হাসান লজ্জা পায়। বলে– না, দেখছিলাম না, হিসাব মিলাচ্ছিলাম।

হিসাব মিলাচ্ছিলেন! কিসের হিসাব। ব্যবসার? হেসে বলে শাহিদা।

- না, অতীতের শাহিদাকে আজকের শাহিদার সাথে মিলিয়ে দেখছিলাম।

মিলল না বুঝি?

হ্যাঁ, আল্লাহর অপূর্ব সৃষ্টি এই নারী জাতি। প্রতি ঋতুতে আল্লাহ এদের দেহ কাঠামোকে পরিবর্তন করে দেন। আর এটাই হলো তাদের সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য।

আমার ভিতর কি এমন পরিবর্তন পেলেন আপনি?

ওটা তোমাকে বলে বুঝানো যাবে না। কারণ যার পরিবর্তন সে নিজে তা বুঝতে পারে না।

- কিছুই কি বুঝতে পারে না?

তা হয়তো পারে, তবে সেই পরিবর্তনের মূল্যায়ন তারা করতে পারে না। মূল্যায়ন করতে হয় পুরুষকে।

তাহলে পুরুষদের পরিবর্তনও তো তারা নিজেরা বুঝতে পারেনা, তা কেবল মেয়েদের চোখেই ধরা পড়ে, আর মূল্যায়নও করতে হয় মেয়েদের। তাই নয় কি?

- না, তা ঠিক নয়। প্রথমতঃ পুরুষদের শরীরের আকর্ষণীয় কোন পরিবর্তন হয় না। বড় জোর পাতলা থেকে মোটা, অথবা মোটা থেকে পাতলা, আর বয়স বাড়লে দাঁড়ি-মোচ এর বেশী কিছু না।

দ্বিতীয়তঃ পুরুষকে মূল্যায়ন করার ক্ষমতা নারীকে দেয়া হয়নি। যেমন ফুলকে দেয়া হয়নি মৌমাছির মূল্যায়ন করার ক্ষমতা। মৌমাছিই ফুলের মূল্যায়ন করে থাকে। সে যাক, তুমি কোন্ কোন্ সাবজেক্টে নিজেকে দুর্বল মনে কর?

ইংরেজী আর অংক। আপনি বসুন, আমি এগুলো রেখে আসি। শাহিদা নাস্তার ট্রে হাতে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

[দুই]

বেশ কিছু দিন থেকেই শাহিনা বেগম ছেলের বিয়ের ব্যবস্থা করার জন্য স্বামী খান বাহাদুর রফিক আহমেদ সাহেবকে তাগাদা দিয়ে আসছেন। খান বাহাদুর সাহেবও চেষ্টার ক্রুটি করছেন না। কিন্তু মনের মত ঘর না পাওয়ায় দেরি হচ্ছে বিয়েতে। তিনি কয়েকজন ঘটককেও বলেছেন একটি ভাল পাত্রীর খোঁজ দেয়ার জন্য। তিনি পরিষ্কার বলে দিয়েছেন, ছেলের কোন ডিমান্ড নেই, গরীব ঘর হলেও চলবে তবে ঘর অবশ্যই খান্দানী হতে হবে। মেয়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা অন্ততঃ ডিগ্রী পাস হতে হবে। চাল-চলন ও ব্যবহার মার্জিত হতে হবে এবং মেয়েকে অবশ্যই ইসলামী জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হতে হবে। কিন্তু খান বাহাদুর সাহেবের এতগুলো শর্তের একত্রে সমন্বয় কোন মেয়ের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না , এ জন্য বিলম্ব হচ্ছে বিয়েতে। তবে দু'টি পাত্রী তিনি হাতে রেখেছেন। তাদের গুণাগুণ খান বাহাদুর সাহেবের দেয়া শর্তের সাথে পূর্ণাঙ্গ মিল না থাকলেও অবহেলা করার মত নয়। তবু তিনি আরো যাচাই করতে চান। এরই মধ্যে একজন খবর নিয়ে এলো একটি মেয়ে পাওয়া গেছে– যার সাথে খান বাহাদুর সাহেবের দেয়া শর্তের সবগুলোরই মিল আছে। কিন্তু একটি শর্তের সামান্য গরমিল আছে, তাহলো খান বাহাদুর সাহেব ডিগ্রী পাস চেয়েছেন আর মেয়েটি আই.এ. ফেল। ফেলও ঠিক বলা যায় না। মেয়েটির যখন আই. এ. পরীক্ষা নিকটে তখনি তার পিতা এক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন। যার কারণে আর পরীক্ষা দেয়া হয় নাই। মেয়েটির মা ও দুই ভাই আছে। বড় ভাই ছোট-খাটো ব্যবসা করে আর ছোট ভাই অষ্টম শ্রেণীতে পড়ে। পিতা ছিলেন একজন মাদ্রাসার মোহাদ্দেস। শুধু শিক্ষাগত যোগ্যতার কিছু তারতম্য ছাড়া খান বাহাদুর সাহেবের দেয়া শর্তের সবগুলো গুণই তার মধ্যে বিদ্যমান। খান বাহাদুর সাহেব যখন শুনলেন মেয়ের পিতা একজন মাদ্রাসার মোহাদ্দেস ও মুফতি ছিলেন তখন তিনি আলহামদুলিল্লাহ বলে আল্লাহর শুকুর আদায় করে বললেন, একজন মোহাদ্দেসের মেয়ে কখনো উচ্ছৃঙ্খল হবে না। শিক্ষাগত যোগ্যতা যা আছে তাতেই চলবে। তিনি ঘটককে মেয়ে ও মেয়ের বাড়ী-ঘর দেখার আয়োজন করতে বললেন।

খান বাহাদুর সাহেবের অনুমতি পেয়ে ঘটক তড়িঘড়ি মেয়ের মা ও ভাইয়ের

সাথে যোগাযোগ করে মেয়ে দেখার তারিখ খান বাহাদুর সাহেবকে জানালেন। ঠিক হলো, শাহিনা বেগম, শাহিদা ও মেহেদী হাসান যাবে মেয়ে দেখতে। ঢাকা থেকে মাইল দশেক দূরে শহরতলীতে মেয়ের বাপের বাড়ি। খান বাহাদুর সাহেব স্ত্রীকে বললেন মেয়ে পছন্দ হলে আংটি পড়িয়ে, দিন তারিখ ঠিক করে এস। শুভ কাজ দেরি করা ঠিক হবে না। অবশ্য মেয়েপক্ষ যদি প্রস্তুতি নেয়ার জন্য সময় চায় তাহলে তাদের সুবিধা মতই দিন ঠিক করবা। স্বামীর কথায় শাহিনা বেগম বললেন, তার আগে রকিবকে ব্যাপারটা জানানো দরকার।
-অফকোর্স। নিশ্চয়ই জানাবে। তবে আমার ধারণা সে অমত করবে না। কারণ সে শিক্ষা আমি তাকে দেই নাই। ঐদিন রাতেই শাহিনা বেগম ছেলে রকিবকে ডেকে সব কিছু খুলে বললেন। সবশুনে রকিব শুধু বলল, আব্বার যেখানে অমত নেই, সেখানে আমার মতামতের প্রয়োজন কি মা? তোমরা যা ভাল বুঝবে করবে, আমার তাতে অমত নেই। তবে মেয়ে দেখার ঝামেলায় আমাকে জড়িও না। হাসানকে নিয়ে যেও। রকিবের কথায় শাহিনা বেগম খুশী হয়ে ছেলেকে দোয়া করলেন।
নির্ধারিত তারিখে শাহিনা বেগম মেয়ে শাহিদা ও মেহেদী হাসানকে সাথে নিয়ে রওনা হলেন পাত্রী দেখতে। মেয়ের বাড়িতে পৌছেই বাড়ির পরিবেশ দেখে ও আন্তরিকতাপূর্ণ অভ্যর্থনা ও অপ্যায়নে সকলেই মুগ্ধ হলেন। খান বাহাদুর সাহেব আগেই ঘটককে বলে দিয়েছিলেন, আমরা স্বাভাবিক পরিবেশে মেয়ে দেখব। মেয়েকে যেন কৃত্রিম প্রসাধনে সজ্জিত করা না হয়। সেই নির্দেশ পেয়ে মেয়েকে কোন সাজ-পোশাকই পড়ান হয় নাই। এতেই শাহিনা বেগম মেয়েকে এক নজর দেখেই মুগ্ধ হলেন। মেয়ের মাথায় খোঁপা বাঁধা ছিল। মেয়েটি যখন শাহিনা বেগমকে সালাম করে উঠে দাঁড়াল তখন শাহিদা মেয়েটির মাথার উড়না সরিয়ে খোঁপাটি খুলে দিতেই আলগা চুলগুলো গড়িয়ে মেয়েটির কোমরের নীচে গিয়ে থামল। চুলগুলো এত ঘন ও কালো যে শাহিদা বলেই ফেলল, ইস্ চুলগুলো যদি আমার হতো। শাহিনা বেগম মেয়ের চুলের আগা ধরে তাতে মুখের থুথু ছিটিয়ে শাহিদাকে ধমক দিয়ে বললেন, ছিঃ ওভাবে বলতে নেই।
-কেন, নজর লাগবে বুঝি? প্রশ্ন করে শাহিদা।
লাগতেও তো পারে! হেসে বললেন শাহিনা বেগম।
বাব্বা! বউ না হতেই এত, বুঝেছি আমার কপালে দুঃখ আছে।

শাহিদার কথায় সকলেই হেসে উঠল। হাসি থামলে শাহিদা মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলেন।

আপনার মা কয়জন?

এখন একজন আল্লাহর ইচ্ছা হলে দু'জন হবে। মেয়েটি জবাব দিল।

আপনার আব্বা কয়জন? শাহিদা আবার প্রশ্ন করে।

ইনশাআল্লাহ দুইজন। এরমধ্যে একজন ইন্তেকাল করেছেন- জবাব মেয়েটির।

শাহিনা বেগম এবার আপ্লুত হয়ে মেয়েটিকে বুকে চেপে ধরে দোয়া করে বললেন, বেঁচে থাকো মা, বেঁচে থাকো। তা তোমার নামটি কি মা?

- শামীমা। শাহিনা বেগমের বুকে মাথা রেখেই ছোট্ট করে বলল মেয়েটি।

বাঃ! শাহিনা, শাহিদা, শামীমা। কি সুন্দর মিল। বললেন শাহিনা বেগম।

হ্যাঁ, মিলতো ভালই মনে হচ্ছে, তবে শামীমা পরে সাপিনী না হলেই রক্ষা। কিগো শামীমা বেগম, পরে ফণা তুলবেনা তো? শাহিদা মুচকি হেসে জিজ্ঞাসা করল।

- সব সাপেরইতো আর ফণা থাকেনা ভাই। ফণা যাদের সৃষ্টিগত স্বভাব তারাই শুধু ফণা তুলে থাকে। আর যে সাপের ফণাই নেই সে ফণা তুলবে কিভাবে? শাহিনা বেগমের বুক থেকে মাথা তুলে বলল শামীমা। হেসে শাহিদার কথার জবাব দেয়ার সময় শামীমার দাঁতগুলো বিকশিত হলে দেখা গেল আনারের দানার মত ছোট ছোট দু'পাটি দাঁত থরে থরে একটার সাথে আর একটা এমনভাবে সাজানো, যেন কোন কারিগর ছাঁচে ঢেলে বসিয়ে দিয়েছে। শাহিনা বেগম দেখলেন মেয়েটির হাসিও প্রাণ জুড়ানো। তিনি মন্তব্য করলেন, মেয়ের দাঁতগুলো খুবই সুন্দর।

হ্যাঁ, তবে বিষদাঁত আছে কিনা দেখে নিও। হেসে বলল শাহিদা।

তুই চুপ করত। ধমকে উঠলেন শাহিনা বেগম।

দুপুরে আহারে বসে শাহিদা শামীমাকে সাথে বসবার জন্য অনেক পীড়াপীড়ি করলেও সে বসল না, পরিবেশন করতে লাগল। খাওয়া শুরু হবার পর শাহিনা বেগম জিজ্ঞাসা করলেন, এসব কি তোমার মা রান্না করেছেন? শামীমা বলল– না, মা প্রেসারের রোগী তাই আগুনের কাছে বসতে পারেন না। মা রান্না করলে এত খারাপ হতো না, মা খুব ভাল রান্না করেন। এগুলো আমি রান্না করেছি, তাই বোধ হয় খেতে খারাপ লাগছে? শাহিনা বেগম কিছু বলার আগেই শাহিদা

বলে উঠল।

তাহলে ভাই তোমার কপালে দুঃখ আছে। আব্বা একদিন এই রান্না খেলে রাঁধুনিকে বিদায় করে তোমাকেই সেখানে নিয়োগপত্র দিয়ে দিবেন।

তাহলে তো আমার মায়ের পরিশ্রম সার্থক হবে, আমি ধন্য হব। বলল, শামীমা।

তুমি খুব বুদ্ধিমতি মা। বললেন শাহিনা বেগম। শাহিনা বেগমের কথায় শামীমা লজ্জা পেয়ে মাথা নত করল। তারপর খাওয়ার পর্ব শেষ হলে মেয়ের বড় ভাইসহ সকলেই বসলেন আলোচনায়। শামীমার বড় ভাই নজরুল ইসলাম এখনও বিয়ে করেনি। বোনকে বিয়ে দিয়ে তবেই সে বিয়ে করবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শামীমার মত তার চেহারাও খুব সুন্দর। তার উপর মুখে চাপ দাঁড়ি, গায়ে সুন্নতি জামায় নজরুল ইসলামকেও একজন মাওলানা বলেই মনে হয়। শাহিনা বেগম শামীমার হাতে আংটি পরিয়ে দোয়া করে বললেন– মেয়ে আমার পছন্দ হয়েছে, এখন আপনারা যদি আমাদের বাড়ি-ঘর ও ছেলেকে দেখতে চান তাহলে দিন ঠিক করে আসুন। আর যদি তা না চান তাহলে আজই বিয়ের দিন ঠিক করে ফেলুন। কারণ ছেলের পিতার তাই নির্দেশ।
শাহিনা বেগমের কথা শুনে নজরুল ইসলাম বলল, আমাদের কোন কিছুই আর দেখার প্রয়োজন নেই, আমরা সব শুনেছি। আপনারা আমাদের মত গরীব ঘরের মেয়েকে পুত্রবধূ করে নিতে আগ্রহী হয়ে এসেছেন এটাই আল্লাহ পাকের অশেষ মেহেরবানী। আমরা কল্পনাও করতে পারি নাই আমার বোন আপনাদের মত বনেদী ঘরের বধূ হয়ে যাবে। নজরুল ইসলামের কথা শুনে শাহিনা বেগম বললেন, সবই আল্লাহর ইচ্ছা। তাছাড়া এখানে আমাদের কোন দয়া বা অনুগ্রহ নেই। শামীমা স্বীয় যোগ্যতার বলেই এই অধিকার আদায় করে নিয়েছে।

আল্‌হামদুলিল্লাহ। তাহলে দিন আপনারাই ঠিক করুন, আমাদের তাতে কোন আপত্তি থাকবে না। এবার শাহিনা বেগম তাকালেন মেহেদী হাসানের প্রতি। মেহেদী হাসান বলল, খালুজান বলেছেন, শুভ কাজ যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভাল। তবু অন্ততঃ পনের দিন সময় হাতে রেখে তারিখ করা ভাল।

বেশ তাই হবে। তুমি ডায়েরী দেখে বল, পনের দিন পর কত তারিখ হয়। বললেন শাহিনা বেগম। মেহেদী হাসান ডায়েরী দেখে বলল, আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারি বুধবার। এবার মেয়ের মা কথা বললেন। তিনি বললেন, ঘটক সাহেব বলেছেন আপনাদের কোন দাবি নেই।

হ্যাঁ, তিনি ঠিকই বলেছেন। আমাদের শুধু একটা সুন্দর মেয়ের দরকার। তবে সে মেয়ে ছেলে বিক্রি করে নয়। যারা ছেলে বিয়ে দিয়ে যৌতুক নেয় তারা অংকে কাঁচা। কারণ আজ যদি আমি ছেলে বিয়ে দিয়ে যৌতুক নেই, তাহলে আমার মেয়েকে যখন বিয়ে দেব তখন কি আমাকে যৌতুক দিতে হবে না? অবশ্যই দিতে হবে। তাহলে লাভ কি হলো? বরং আল্লাহর দরবারে তাঁর নির্দেশ অমান্য করার দায়ে গোনাহগার হতে হবে। অন্যদিকে যার ঘরে একটি ছেলে তিনটি বা চারটি মেয়ে আছে তার অবস্থা একবার চিন্তা করুন? সমাজে এই অভিশাপ কিছু স্বার্থপর অর্থলোভী মানুষ চালু করেছে। আসলে এতে দু'একজন মানুষ উপকৃত হলেও অধিকাংশ মানুষ হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত। তাছাড়া এই প্রথা ধর্মীয় বিধানেরও পরিপন্থী কাজ। মুসলমানদের জন্য যৌতুক নেয়া-দেয়া দু'টাই পাপ।

শাহিনা বেগমের কথা শুনে নজরুল ইসলাম খুশী হয়ে বলল, মাওয়ই মা আজ আপনার কণ্ঠে আব্বার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। আব্বাও ঐ কথাগুলোই বলতেন। তিনি বলতেন, আমি আমার ছেলেদের বিয়েতে যৌতুক নেবও না, মেয়ের বিয়েতেও যৌতুক দেব না। তাই বুঝি আল্লাহ দু'টি সমমনা পরিবারকে একত্রে মিলন ঘটাতে যাচ্ছেন।

হ্যাঁ, তাই হবে। নেক্কার বান্দাদের আল্লাহ এভাবেই মদদ করে থাকেন। শাহিনা বেগম এবার মেয়ের মায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, তাহলে বিয়াইন সাহেবা ঐ কথাই থাকল, আগামী পঁচিশ তারিখ বাদ যোহর বর ও বরযাত্রী ইনশাআল্লাহ হাজির হবে। আমাদের তরফ থেকে পনের-বিশজন লোক আসবে, আপনারা সেভাবেই প্রস্তুতি নেবেন। হ্যাঁ আর একটা কথা বলতে বলে দিয়েছেন আপনার বিয়াই সাহেব, তাহলো আপনারা কষ্টকরে বা দেনা করে কিছুই করবেন না। আপনারা যদি মেয়েকে জাক-জমকের সাথে বিয়ে দিতে গিয়ে দশ বিশ হাজার টাকা ঋণ করেন সে প্রভাব বৌমার উপর ক্রিয়া করবে। সে চিন্তা করবে আপনাদের জন্য। এজন্যই আপনার বিয়াই সাব কথাগুলো আপনাকে বলতে বলেছেন।

বিয়াই সাহেব জ্ঞানী ও বিচক্ষণ তাই মানুষের দুঃখ-কষ্ট তিনি বোঝেন। আল্লাহর এ রহমত, আপনাদের মেহেরবানীর ঋণ আমি শুধরাতে পারবনা, দোয়া করি আল্লাহ এ সম্পর্ক অটুট রাখুন। কথা কয়টি বলতে গিয়ে মেয়ের মার চোখের পানিতে দুই গন্ড ভিজে গেল। শাহিনা বেগম উঠে দাঁড়িয়ে

বললেন, এবার আমাদের বিদায় দিন। তিনি শামীমাকে কাছে টেনে নিয়ে কপালে একটি স্নেহ চুম্বন এঁকে দিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে শামীমা শাহিনা বেগমের পায়ের কাছে বসে তার পা ছুঁয়ে সালাম করল। শাহিনা বেগম শামীমার দুই হাত ধরে তুলে আর একবার বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, লক্ষ্মী মা আমার। যাবার সময় শাহিদা শামীমাকে বলল, তোমার ভাইয়ের তো মুখ ভর্তি সুন্দর চাপ দাঁড়ি আমার ভাইয়ের মুখ কিন্তু পরিষ্কার। শামীমা হেসে বলল, দাঁড়ি বুঝি তোমার খুব পছন্দ? শাহিদা বলল, পছন্দের কথা নয়, সুন্দর মুখে কালো দাঁড়ি সৌন্দর্যকে বৃদ্ধি করে।

ওঃ তাই! তোমার ভাইয়ের মুখেও দাঁড়ি উঠবে ইনশাআল্লাহ। ওরা গিয়ে গাড়ীতে উঠল। সামান্য কয়েক ঘন্টার পরিচয় দু'টি অজানা পরিবারের মাঝে যে আন্তরিকতা ও হৃদ্যতা দেখা গেল তাতে মনে হলো যুগ যুগ ধরে এদের পরিচয়। বিশেষ করে শাহিদা ও শামীমার কথাবার্তা শুনে মনে হতে লাগল ওরা দু'জন ছোটবেলার বান্ধবী। প্রথম দু-একবার আপনি সম্বোধন হলেও পরে তা তুমিতে নেমে আসে।

খান বাহাদুর রফিক সাহেব স্ত্রী ও মেয়ের মুখে সব শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন। তিনি যেমনটি চেয়েছিলেন আল্লাহ ঠিক তেমনটিই জুটিয়ে দেয়ায় আল্‌হামদুলিল্লাহ বলে আল্লাহর শুকুর আদায় করে স্ত্রীকে বললেন, আচ্ছা রকিবের মা, হাজার দশেক টাকা পাঠিয়ে দিলে কেমন হয়?

- কেন, টাকা পাঠাবেন কেন? জানতে চান শাহিনা বেগম।

না, মানে অভাবী সংসার, বিয়ের ব্যাপার তো, তাই পাঠালে ওদের কিছু উপকার হতো এই আর কি, অন্য কিছু নয়।

ঐ কাজটি করতে যেওনা। যত অভাবই থাক ওরা খান্দানী বংশ। কোনক্রমেই অনুগ্রহের দান ওরা গ্রহণ করবে না। মাঝখানে নিজেদের ছোট হতে হবে। আমি ওদের বলে এসেছি সাদামাটা অনুষ্ঠান করতে। সাধ্যের বাইরে কিছু করতে আমি নিষেধ করেছি।

বেশ, তাই হবে। তুমি আগামীকাল থেকেই খরচপত্র করা শুরু করে দাও। সত্যিই! বাড়িতে একটা বৌ না থাকলে বাড়িটাই মনে হয় অন্ধকার।

বৌ কোথায়? যে আসছে সে মেয়ে হয়েই আসছে, আসলে ধর্মীয় শিক্ষাই মানুষকে মহৎ হতে সাহায্য করে। মাটির মানুষ রূপান্তর হয় সোনার মানুষে।

অত্যন্ত সত্য কথা। সবই আল্লাহর ইচ্ছা।

এমন সময় শাহিদা সেখানে আসতেই খান বাহাদুর সাহেব তাকে লক্ষ্য করে বললেন, তোর বান্ধবী আনোয়ারাকে এ খুশীর খবরটা দিয়েছিস মা?

না। গম্ভীর কণ্ঠে বলল শাহিদা।

কেন? প্রশ্ন করেন খান বাহাদুর সাহেব।

আমি একটুও খুশী না।

তুই খুশী না? কি হয়েছে? বিস্ময় ভরা প্রশ্ন, খান বাহাদুর সাহেবের।

- ঐ মেয়ে বাড়িতে আসলে তোমরা আমাকে মোটেও আদর করবে না।

শাহিদার কথা শুনে খান বাহাদুর সাহেব হোঃ হোঃ করে হেসে উঠে বললেন, ওঃ এই কথা। একটি মেয়ের গৌরবতো ওখানেই মা, যখন সে পরকে আপন করে নিতে পারে। তুইও নিজেকে সেভাবেই গড়ে তোল, যেন তুই যে বাড়িতে যাবি সে বাড়ির মেয়েরা তাদের বাপ-মাকে তোর মত বলতে পারে, ঐ মেয়ে বাড়িতে আসলে আমাদের আদর কম হয়ে যাবে। আর যারা শ্বশুর-শাশুড়ীকে পিতা-মাতার আসনে বসাতে পারে; রাসূল (সাঃ) তো ঐ সমস্ত রমণীদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন, "যার ঘরে আদর্শ রমণী আছে তার ঘরে জান্নাত আছে, যদিও সে গরীব হয়?"

- এক কাপ চা খাবে আব্বা? শাহিদা মুচকি হেসে জিজ্ঞাসা করল।

তা মন্দ হয় না, গলাটা কেমন শুকিয়ে গেছে।

[তিন]
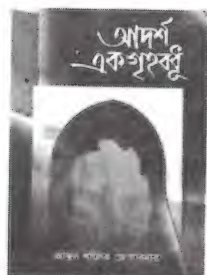
ঠিক সময় মতই বিয়ের ঝামেলা মিটে গেছে, খান বাহাদুর সাহেব তার একমাত্র ছেলের বৌভাত খুব জাক-জমকের সাথেই সম্পন্ন করেছেন। শহর ও গ্রামের কোন আত্মীয়-স্বজনকেই বাদ দেন নাই। সকলেই বৌ দেখে প্রশংসা করেছেন। রকিব তার বন্ধু-বান্ধব ও বারের উকিল সাহেবদের ডেকেছিল। উপহার-উপঢৌকনও প্রচুর এসেছে বৌভাতে। এরই মধ্যে রকিব বিয়ের ফিরানী ঘুরে এসেছে। এ বিয়েতে রকিবও যেমন খুশী হয়েছে তেমনি শামীমাও। কারো কোন অভিযোগ নেই কারও বিরুদ্ধে। যেন এমনটিই চেয়েছিল উভয়ে। শামীমা বৌ হয়ে আসার পর থেকেই বাড়ির পরিবেশ বদলে গেছে। ফিরানী শেষে ফিরে এসেই সে

সংসারের কাজে জড়িয়ে নিয়েছে নিজেকে। শাহিনা বেগমকে এখন আর কিছুই করতে হয় না। ফজরের নামাজ আদায় করেই সে ঢোকে রান্না ঘরে। চা-নাস্তা তৈরী করে খেতে দেয় শ্বশুরকে। আগে কাজের মেয়েটা নাস্তা পৌঁছে দিত খান বাহাদুরের ঘরে, এখন শামীমা নিজের হাতে পৌঁছে দেয়। শাহিনা বেগম একদিন বলেছিলেন, তুমি কেন কষ্ট করে চা-নাস্তা নিয়ে যাও মা, শিউলীকে দিলেই তো পার। শামীমা জবাবে বলেছিল, বাড়ির মুরব্বীদের খাবার কাজের লোকের হাতে পাঠান বেয়াদবি মা, এতে মুরব্বীদের অবজ্ঞা করা হয়। সেদিন থেকে শাহিনা বেগম আর কিছু বলেননি বৌকে। আর শাহিদার সাথে তো গলায় গলায় মিল। ননদ-ভাবী বলে মনেই হয় না। মনে হয় দু'টি বোন। মাত্র এক মাসেই বাড়িটায় যেন শান্তির ফুয়ারা ছুটেছে। খান বাহাদুর সাহেব মাঝে মাঝে স্ত্রীকে বলেন, এত সুখ বুঝি কপালে সইবে না। শাহিনা বেগম বাঁধা দিয়ে বলেন, ও কথা বলতে নেই সুখ-দুঃখ সবই আল্লাহর দান। খান বাহাদুর সাহেব আর কিছু বলেন না। অন্যদিকে মেহেদী হাসানের কর্ম দক্ষতায় ব্যবসায় দিন দিন উন্নতি বেড়েই চলেছে। খান বাহাদুর সাহেব আরো একটা কোল্ড স্টোরেজ খরিদ করার চিন্তা-ভাবনা করছেন। এদিকে রকিবের প্রসারও বেড়েছে। এতদিন রকিব বারের সিনিয়র এডভোকেট তোফাজ্জল হোসেনের সহকারী হিসেবেই কাজ করে আসছিল। এখন পৃথক চেম্বার খোলার চিন্তা-ভাবনা করছে। এডভোকেট তোফাজ্জল হোসেনের আরো দুইজন সহকারী আছে। একজন পুরুষ অন্যজন মহিলা। বিরাট ধনী একটি জুট মিলের মালিক আব্দুল গফুর চৌধুরীর একমাত্র কন্যা পারভীন এম.এ, এল.এল.বি পাস করে সখের ওকালতি করতে বারে নাম লিখিয়েছে। তবে রকিবের মত বাকপটু তারা নয়। তাই রকিবের সিনিয়র রকিবকে সকলের থেকে অন্য দৃষ্টিতে দেখেন। তিনি অনেক বড় বড় জটিল মামলার আরজি রকিবকে দিয়ে লেখান এবং অনেক মামলার সওয়াল জবাবও রকিবকে দিয়ে করিয়ে থাকেন, অবশ্য তিনিও পাশে থাকেন।

এদিকে শাহিদার বি.এ পরীক্ষা পিছিয়ে যাওয়ায় পড়ার তেমন চাপ না থাকলেও মেহেদী হাসান দু'বেলাই শাহিদাকে পড়িয়ে যাচ্ছে। ফজরের পর ৯টা পর্যন্ত পড়া দেখিয়ে দিয়ে সে ছোটে বাইরে ব্যবসার কাজে। আবার কাজ সেরে বিকালে বাসায় ফিরে মাগরিবের নামাজ আদায় করে রাত ১০টা পর্যন্ত পড়া দেখায়। তারপর রাতের আহার শেষে ক্লান্ত শরীর টেনে নিয়ে নিজের রুমে গিয়ে শুয়ে পড়ে। এভাবেই দিন যায় দিন আসে। হঠাৎ একদিন হাসান নিজের

মধ্যে কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করে। সে বুঝতে পারে মনের অলক্ষ্যেই সে এগিয়ে যাচ্ছে এক ভয়ংকর কঠিন পথের দিকে। সে শাহিদার প্রতি নিজের মনের দুর্বলতা বুঝতে পারে। বুঝতে পেরেই চমকে ওঠে হাসান। এ সে কি করছে? না-না, এ দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেয়া চলবে না। এত বড় উপকারের বিনিময়ে বিশ্বাসঘাতকতা সে কিছুতেই করতে পারে না। এই দুর্বলতা যদি সামান্যতমও প্রকাশ পায় তাহলেই তার খালা-খালুর কাছে বিশ্বস্ততা হারাবে সে, তাকে আর কেউ বিশ্বাস করবে না। সাহিদাও আর তাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখবে না। ওরা ভাববে আমি তাদের স্নেহ, ভালবাসার সুযোগ নিয়ে সর্বনাশ করতে উদ্ধত হয়েছি। তাছাড়া মায়ের কাছে যখন এ খবর পৌঁছাবে, লজ্জা-দুঃখে মার মাথা কাটা যাবে। বিরাট অর্থ-সম্পদের মালিক খান বাহাদুর তারই সামান্য এক কর্মচারীর কাছে তার মেয়েকে কখনো তুলে দিবেন না। আর শাহিদাই বা একজন অর্থ-সম্পদহীন যুবককে স্বামীত্বে বরণ করে নেবে কেন? বিরাট অর্থ-প্রাচুর্যের মাঝে সে লালিত-পালিত। তাকে বিয়ে করার জন্য কত ধনকুবের সন্তানরা একপায়ে হবে খাড়া, সেখানে মেহেদী হাসানের অস্তিত্বই তো বিলিন হয়ে যাবে। অর্থাৎ মনের এই দুর্বলতা বিলাসীতা ছাড়া আর কিছুই নয়। ধর্ম এজন্যেই নারী-পুরুষকে পৃথক পৃথক গন্ডিতে অবস্থান করতে বলেছে। হাসান মন থেকে সব দুর্বলতা মুছে ফেলার সিদ্ধান্ত নিল। সে আরো সিদ্ধান্ত নিল শাহিদাকে আর পড়াবে না বলে। কিন্তু পরক্ষণেই চিন্তা করল, হঠাৎ পড়াতে যাওয়া বন্ধ করলে খালা-খালু যখন কৈফিয়ত চাইবেন তখন তাদের সে কি বলবে? আর শাহিদাই বা কিভাববে? এরূপ চিন্তা-ভাবনা করে সে আবার মত পরিবর্তন করল। ভাবল, পড়াতে যাবে, কিন্তু আগের মত আর মিশবে না। গল্প-গুজবও আর করবে না আগের মত। সেদিন সারা রাত ঘুম হলো না হাসানের।

হাসানের হঠাৎ এই পরিবর্তন শাহিদার চোখে ধরা পড়ে গেল। শাহিদা ভাবল হয়তো আমার কোন ব্যবহারে হাসান ভাই রাগ করেছেন। তাই একদিন অতি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল– হাসান ভাই, আপনি সব সময় অন্য মনস্ক হয়ে থাকেন কেন? কি হয়েছে আপনার? শাহিদার কথার জবাবে হাসান বলে, কৈ কিছু হয়নিতো!

নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে। তা না হলে সব সময় অমন মন মরা হয়ে থাকেন কেন?

তোমার সামনে পরীক্ষা। এখন গল্প করার সময় নয়, মন দিয়ে লেখা-পড়া

কর। প্রসংগ পাল্টিয়ে বলল হাসান। এরপর শাহিদা আর কোন প্রতিবাদ না করে পড়ায় মন দিল। কিন্তু মনে তার খুঁৎখুঁতি থেকেই যায়। অনেক চেষ্টা করেও নিজের তরফ থেকে কোন অপরাধ আবিষ্কার করতে পারে না সে। আবার অন্য কোন সূত্রও সে খুঁজে পায় না। তাই একদিন অবসর সময় সাহিদা শামীমাকে জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা ভাবী, কোন হাসিখুশী মানুষ যদি হঠাৎ অন্য মনস্ক হয়ে পড়ে, তার মুখের মধুমাখা কথা যদি বিষাদ মনে হয় তাহলে তার পিছনে কি কারণ থাকতে পারে?

- অনেক কারণই থাকতে পারে। যেমন ঃ মানসিক দুঃশ্চিন্তা, প্রেমের ব্যর্থতা, অর্থের অনাটন, বেকারত্ব, পারিবারিক কলোহ, স্ত্রীর অবাধ্যতা ইত্যাদি। বলল, শামীমা।

তুমি এতক্ষণ বেকার পেচাল পাড়লে। অথচ এক কথায় জবাব দেয়া যেত।

- কিভাবে?

তুমি যে কারণগুলো বর্ণনা করলে তার সংক্ষিপ্ত জবাব হলো মানসিক অশান্তি। অর্থাৎ মানসিক অশান্তি সৃষ্টির কারণ ওগুলো। তাই তুমি এক কথায় জবাব দিতে পারতে এই বলে যে, অন্যমনস্ক বা চিন্তাগ্রস্থ হবার কারণ মানসিক অশান্তি, ব্যাস এক কথায় সব শেষ।

- বেশ, হার মানছি। এখন জানতে পারি কি হঠাৎ ননদিনীর মুখে এ ধরনের দার্শনিক প্রশ্ন কেন বের হলো? তেমন কোন ঘটনার সূত্রপাত কোথাও ঘটেছে কি?

তার মানে?

মানে ননদিনীর মনের বনে কোন ভ্রমরের আবির্ভাব ঘটেছে কিনা তাই জানতে চাইছিলাম। বলেই শামীমা মুখ টিপে হাসতে লাগল। তা দেখে শাহিদা কৃত্রিম গোস্বার ভান করে বলল, ভাবী ভাল হবে না বলছি। মনের বনে ভ্রমর তাদেরই আসে, যাদের বন থাকে অরক্ষিত।

- অনেক সময় রক্ষিত বনেও কিন্তু কল্পনার ভ্রমর উড়ে।

কল্পনার সাথে বাস্তবের কি সম্পর্ক?

সম্পর্ক অতি নিগুঢ়। কল্পনাই একদিন বাস্তবে রূপ নেয়। তবে সে কল্পনা কারো থাকে পরোক্ষ, কারো থাকে প্রত্যক্ষ। পরোক্ষ কল্পনাকে খুঁজতে হয়, আর প্রত্যক্ষ কল্পনাকে খুঁজতে হয় না। শুধু বাস্তবে রূপ দিতে হয়।

সেরূপের ধরন কি?

শামীমা শাহিদার চিবুক ধরে নাড়া দিয়ে বলল, ওটা বলে দিতে হয় না।

আপনার থেকেই ধরন সৃষ্টি হয়ে যায়। কিন্তু হঠাৎ এসব কথা কেন?

না, মানে তোমার সাথে এমনিতেই একটু রসিকতা করছিলাম। আচ্ছা ভাবী, বিয়ের তো প্রায় দেড়-দুই মাস হতে চলল, এর মধ্যে ভাইজানের সাথে তোমার কোনরূপ মতানৈক্য বা মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়নি?

না, মতানৈক্য বা মনোমালিন্য সাধারণতঃ স্ত্রীদের কারণে ঘটে থাকে। স্ত্রীরা যদি স্বামীদের সে সুযোগ না দেয় তাহলে ঘটবে কেন?

মানে?

- আর মানে শুনতে হবে না। এখন যাও বইয়ের মানে পড় গিয়ে। সময় যখন আসবে তখন মানে বলে দিব। শামীমা উঠে যাচ্ছিল; কিন্তু শাহিদা পিছন থেকে কাপড় টেনে ধরতে সে ফিরে দাঁড়াল, আর ঠিক তখনি রকিব এসে দরজায় দাঁড়াতেই শাহিদা শামীমার কাপড় ছেড়ে দিয়ে বলল, ভাইজান, ভাবী সব সময় কিন্তু আমার সাথে ঝগড়া করে, তুমি সাবধান করে দিও। বলেই সে দ্রুত ঘর থেকে বের হয়ে গেল। শামীমা হাসতে হাসতে বলল, দুষ্ট কোথাকার। তারপর রকিবের গায়ের কোর্ট খুলে আলনায় রেখে লুঙ্গি ও সেন্ডেল সামনে এগিয়ে দিয়ে হাত মুখ ধুয়ার পানি দিতে চলে গেল।

মসজিদ থেকে আসরের নামাজ আদায় করে খান বাহাদুর রফিক আহমেদ সোজা স্ত্রীর ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। শাহিনা বেগম তখন কেবল নামাজ শেষ করে তসবিহ গুণ ছিলেন। খান বাহাদুর ঘরে ঢুকেই জিজ্ঞাসা করলেন, বৌমা কোথায়? শাহিনা বেগম জবাবে বললেন, বোধ হয় শাহিদার ঘরে নামাজ পড়ছে। কেন কিছু বলবে?

- না, এমনি জিজ্ঞাসা করছিলাম। হ্যাঁ, তোমাকে একটা কথা বলতে এলাম। আমারই এক বাল্য বন্ধু শরিফুল ইসলাম, তুমি তাকে ভাল ভাবেই চিন।

- হ্যাঁ, আগে প্রায়ই আসতেন আমাদের বাসায়। তুমি তাকে কয়েকবার টাকাও ধার দিয়েছিলে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি ঠিক ধরেছ। তবে তখন যে শরিফুল ইসলামকে তুমি দেখেছিলে সেই শরিফুল আর এখন নেই। একদিন সে আমার কাছ থেকে টাকা ধার নিয়েছিল বটে; কিন্তু এখন সে আমাকে কিনে নিতে পারে। শুধু দেশেই না, বিদেশেও সে তার ব্যবসার পরিধি বিস্তার করেছে। ধর্ম-কর্মের দিকেও খুব মনোযোগী। দু'বার হজ্ব করেছে। একবার তো আমার সাথেই গিয়েছিল।

কি হয়েছে তার? শাহিনা বেগম প্রশ্ন করেন।

- না, হয় নাই কিছু। গতকাল শহরে হঠাৎ তার সাথে আমার দেখা। কিছুতেই

ছাড়ল না, টেনে নিয়ে গেল একটি রেষ্টুরেন্টে। তারপর চা-নাস্তার এক ফাঁকে বলল, বড় ছেলে বিলেত থেকে দেশে ফিরেছে, এখন তাকে বিয়ে দিতে চায়। আমার ছেলে-মেয়েদের খোঁজ-খবর নিবার এক পর্যায়ে শাহিদার কথা আসতেই আমার হাত ধরে বলল, দোস্ত তোমার ঐ মেয়েটিকে আমায় দাও, সে একেবারেই নাছোড় বান্দা। অনেক বলে-কয়ে তবে রেহাই পেয়েছি। আমি বলেছি তোমার ভাবীর সাথে আলোচনা করে তোমাকে জানাব। তবে আমার মতে বিয়ে হলে মন্দ হবে না।

শাহিদা যে পরিবেশে ও মানসিকতায় গড়ে উঠেছে তাতে ও কি পারবে বিলেত ফেরত স্বামীর সাথে ঘর করতে?

বিলেত ফেরত হলেও ধার্মীক পিতার পুত্র, তাই উগ্র আধুনিকতা সেখানে না থাকারই কথা। তুমি ভাল করে চিন্তা করে দেখ ব্যাপারটা।

এখন ওসব বিষয় নিয়ে আলোচনার কোন দরকার নেই। শাহিদার পরীক্ষা না হওয়া পর্যন্ত বিয়ের চিন্তা আমি করছি না। পরীক্ষা হোক, রেজাল্ট হোক, তারপর চিন্তা-ভাবনা করা যাবে।

- রেজাল্ট যাই হোক, ওকে আর পড়াবার ইচ্ছা আমার নেই। ভার্সিটির বর্তমান অবস্থা বড় কঠিন, বড় ভয়াবহ। তুমি হয়তো শুনে থাকবে ঢাকার বুকে এমন একটি ভার্সিটি আছে। সে ভার্সিটির পড়ুয়া মেয়েদের কেউ বিয়ে করতে চাচ্ছে না। চিন্তা কর কি লজ্জার কথা। এছাড়াও প্রতিটি ভার্সিটিতেই এখন গড়ে উঠেছে রাজনৈতিক দুর্গ। লেখা-পড়ার পরিবেশ আর সেখানে নেই। সেখান থেকে ছেলেরা বাড়ি ফিরছে লাশ হয়ে, আর মেয়েরা ফিরছে সতীত্ব হারিয়ে। আমি চাইনা আমার মেয়েও তাদেরই একজনে পরিণত হোক। আল্লাহর ইচ্ছায় আমার মেয়েকে যখন চাকরি করে ভাত খেতে হবে না তখন তার জন্য ডিগ্রী পাসই যথেষ্ট।

চাকরি না করলেও উচ্চ শিক্ষার মর্যাদাই আলাদা।

সেটা যদি চরিত্র ধ্বংসের বিনিময়ে হয় তবুও?

না। চরিত্র ধ্বংস করে কোন কিছুই কাম্য নয়। তবে সব মেয়েরই যে চরিত্র ধ্বংস হবে, সব ছেলেই যে লাশ হয়ে ফিরবে সেটাও ঠিক নয়।

কিন্তু তুমি যখন কনফার্ম নও তোমার মেয়ে সম্বন্ধে তখন অনিশ্চিয়তার দায়িত্ব না নিয়ে সাবধান হওয়াই কি বুদ্ধিমানের কাজ নয়? এতে আর যাই হোক দুঃশ্চিন্তা ও উদ্বিগ্নের হাত থেকে বাঁচা যায়। যে দেশে ছেলে-মেয়েদের কলেজ-ভার্সিটিতে পাঠিয়ে বাপ-মাকে উদ্বিগ্নের সাথে থাকতে হয় পথের দিকে

তাকিয়ে, যে দেশের সরকার ছাত্র-ছাত্রীদের পুঁজি করে ক্ষমতায় টিকে থাকার রাজনীতি করে, যে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পবিত্রতা রক্ষা করতে সরকার ব্যর্থ, সে দেশের ছেলে-মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার আশা না করাই উচিত। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কার করে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হবে অথবা ওগুলোর বিলুপ্তি করে সেখানে ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তুলতে হবে। অন্যথায় সচেতন দেশবাসীকে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার জন্য আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।। কিন্তু এদেশে তার কোনাটাই সম্ভব নয়। জ্বী-হুজুরের এদেশে হুজুরের ইচ্ছাই দেশবাসীর ইচ্ছা। অতএব, নিজের বিড়াল বেঁধে রাখ। এমন সময় দু'কাপ চা নিয়ে ঘরে ঢুকল শামীমা। শামীমাকে চা হাতে ঘরে ঢুকতে দেখে খান বাহাদুর সাহেব বলে উঠলেন, একেই না বলে মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি। আমি মনে মনে তোমাকেই খুঁজছিলাম।

- খুঁজতে হবে কেন আব্বা? আপনি এ সময় চা খান সেত আমার জানা আছে– চায়ের কাপ টেবিলে রাখতে রাখতে শামীমা বলল। শাহিনা বেগম চায়ের কাপ হাতে তুলে নিতে নিতে বললেন, বৌমা-

বাঁধা দিয়ে শামীমা বলল, আপনারা আমাকে বৌমা বৌমা বলে ডাকলে আমি ব্যথা পাই- মা। আমি এ বাড়িতে বৌ হয়ে আসিনি, এসেছি মেয়ে হয়ে। শাহিদার মত আমাকেও শামীমা বলে ডাকবেন। আমি আপনাদের মেয়ে হয়েই থাকতে চাই মা। শামীমার কথা শুনে শাহিনা বেগম চায়ের কাপ রেখে উঠে দাঁড়ালেন এবং শামীমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, তাই হবে মা, আজ থেকে বৌমা বা তুমি বলে আর ডাকব না, ডাকব শামীমা বলে।

হ্যাঁ মা, তাই ডাকবেন, ঐ ডাকে দূরত্ব দূর হবে। এবার শাহিনা বেগম শামীমাকে বুক থেকে তুলে কপালে একটি চুম্বন এঁকে দিয়ে বললেন, লক্ষ্মী মেয়ে। শামীমা শাশুড়ীর বুক থেকে মুক্ত হয়ে দৌড়ে পালাতে যাচ্ছিল এমন সময় খান বাহাদুর সাহেব ডাকলেন, এই মেয়ে যাচ্ছ কোথায়? শ্বশুরের গম্ভীর কণ্ঠের ডাক শুনে শামীমা ঘুরে দাঁড়াল এবং শ্বশুরের সামনে এসে মাথা নিচু করে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল। খান বাহাদুর সাহেব বললেন, শুধু মেয়ের অধিকার আদায় করে নিয়ে পালাচ্ছ যে, আমার বেলায় কি হুকুম তাতো বললে না? খান বাহাদুরের কথার জবাবে শাহিনা বেগম বললেন, তোমার বেলায় আবার কি? তুমিও ওভাবেই ডাকবে। খান বাহাদুর সাহেব বললেন, না, আমি ওভাবে ডাকব না। আমি ডাকব শুধু মা। এবার শামীমা হেসে বলল, বাঃ তাহলে তো আমি একটা বুড়ো ছেলে পেয়ে যাব, কি মজা! বলেই সে ছুটে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। তা দেখে স্বামী-স্ত্রী উভয়ই হেসে উঠলেন।

[চার]

শাহিদার পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। শামীমা তার মায়ের অসুখের খবর পেয়ে এরই মধ্যে তার বাপের বাড়ি গিয়ে এক সপ্তাহ থেকে এসেছে। শাহিদার পরীক্ষা শেষ হবার পর মেহেদী হাসান যেন শান্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বেঁচেছে। সে এখন অধিকাংশ সময় ব্যবসা দেখা-শোনার কাজে বাইরে সময় কাটায়। বাড়িতে ফেরে রাতে। খান বাহাদুর সাহেবকে রোজই হিসাব বুঝিয়ে দেয় সে এবং জরুরী কোন পরামর্শ থাকলে তা শেষ করে রাতের আহার সেরে শুয়ে পড়ে। কথা যা দু-একটা বলার তা খালা শাহিনা বেগম ও শামীমার সাথে বলে। পারত পক্ষে শাহিদাকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে মেহেদী হাসান। শাহিদা হঠাৎ যদি সামনে পড়ে যায় এবং কিছু জিজ্ঞাসা করে তাহলে জিজ্ঞাসার জবাবটুকু ছাড়া অতিরিক্ত একটি কথাও বলে না। শাহিদা অবাক হয় তার এ ব্যবহারে। শাহিদা ভেবে পায় না, হাসান ভাই কেন তার সাথে এমন ব্যবহার করে এড়িয়ে চলতে চায়। সে চিন্তিত হয়ে পড়ে। সেই চিন্তার সাথে ইদানিং মনের অজান্তেই কিছু অভিমানও এসে যোগ হতে শুরু করেছে যেন। কিন্তু এই চিন্তা ও অভিমানের কারণ সে খুঁজে পায় না। হাসান তার খালাত ভাই। সে এসেছে পিতার ব্যবসা দেখাশোনা করতে। বিনিময়ে পিতা তাকে বেতন দেন। তবে নিকট আত্মীয় হওয়াতে পরিবারের সাথে অবাধে চলাফেরার অধিকার তার আছে। হাসানের জায়গায় যদি বাইরের অন্য কোন লোক হতো তাহলে সে অন্দরে প্রবেশেরই অধিকার পেতনা। তাহলে তার বিষয় নিয়ে এত চিন্তা করে মরছে কেন সে? হাসান সুপুরুষ, চরিত্রবান ব্যক্তিত্ব ও ধার্মীক। ইসলামে তো অবাধ মেলামেশা বৈধ নয়। হয়তো সেজন্যই হাসান ভাই আমাকে এড়িয়ে চলতে চান। তাছাড়া যা লাজুক! মেয়েদের সামনে মাথা উঠিয়ে কথা বলতে লজ্জা পায়। শামীমা ভাবীতো একদিন বলেই ফেলেছিল, হাসান ভাই আপনি পুরুষ না মেয়ে তাইতো বুঝতে পারলাম না। লজ্জাতো নারীর ভূষণ বলে জানি, পুরুষও যে মেয়েদের মত লজ্জাবতী হতে পারে আপনাকে দেখার আগে কিন্তু ধারণা ছিল না। জবাবে সেদিন হাসান ভাই বলেছিলেন, আমাদের প্রিয়নবী (সাঃ)-এর লজ্জা ছিল নব বধূর চেয়েও বেশী। তাই লজ্জা শুধু নারীর ভূষণ নয়, পুরুষকেও করে মহিমান্বিত।

শাহিদা এসব কথা মনে করে নিজেকে চিন্তামুক্ত করতে চায়।

কেটে যায় আরো কিছু দিন। শাহিদা আর মেহেদী হাসানের কথা ভাবে না। মন থেকে সব চিন্তা দূর করে পূর্বের মত স্বাভাবিক ভাবে চলাফেরা করতে থাকে সে। শাহিদার এখন অধিকাংশ সময় কাটে শামীমার সাথে গল্প করে। একদিন বিকালে সাহিদা দোতলার বেলকনিতে বসে গুণগুণ করে একটি গানের সুর করছিল। এমন সময় বান্ধবী আনোয়ারা সেখানে উপস্থিত হয়ে হাসিমুখে বলল, কিরে সই, আজ তোকে এত খুশীখুশী মনে হচ্ছে কেন? ব্যাপারটা কি?
- ব্যাপার তোর মাথা। খুশী আবার দেখলি কোথায়? তোর মনের বনে বুঝি রং লেগেছে, তাই দুনিয়াটাই রঙিন দেখছিস। বল না ভাই, সেই লোকটি কে?
বারে আমার লাঠি আমারই মাথায়। আজব দুনিয়ারে বাবা। যাকগে, ডেকেছিস কেন?
খুব বুঝি তাড়া? বাড়িতে কাউকে রেখে এসেছিস না কি?
- তোর মুখে ছাই। বাড়িতে আবার রেখে আসব কাকে? আনোয়ারার কথা শুনে শাহিদা হিঃ হিঃ করে হেসে উঠল। আনোয়ারা কৃত্রিম ক্রোধে বলল, দেখ শাহিদা ভাল হবে না বলছি।
আরে হবে হবে। নিজের মনের কথা অন্যের মুখে শুনলে সবারই আনন্দ লাগে, যার প্রকাশ ঘটে ক্রোধের মাধ্যমে। সত্যি তোর মত সুন্দরী যার ঘরে যাবে তার ভাগ্যের প্রতি আমারই হিংসা হচ্ছে। ইস্ আমি যদি পুরুষ হতাম! শাহিদার কথা শেষ হয়না– আনোয়ারা তার মাথার চুল টেনে ধরল। শাহিদা উঃ শব্দ করে বলল, সই চুল ছাড়, ছিঁড়ে যাবে। ছাড়, ছাড়, বড্ড লাগছে সই– আর বলব না। আনোয়ারা চুল ছেড়ে দিল। সাহিদা চুল ঠিক করতে করতে বলল, বাপরে বাপ কি দাজ্জাল মেয়েরে বাবা।
এতেই! আর তোর বর যখন ---- তখন কি করবি? আনোয়ারা জিজ্ঞাসা করল।
তখন সালিসের জন্য তোকে ডাকব।
পারবি? সে হিম্মত আছে?
- কেন থাকবে না?
এই জন্য থাকবে না, মেয়েরা পৃথিবীর সব কিছর বিনিময়ে হলেও স্বামীর একচ্ছত্র অধিকার রক্ষা করে থাকে, সেখানে দ্বিতীয় জনের প্রবেশ সহ্য করতে পারে না। সে দ্বিতীয়জন যত আপনই হোক, ঐ সাম্রাজ্য শুধু একজনের জন্যই।
কিন্তু যারা দু'টি তিনটি করে বিয়ে করে?
যারা প্রয়োজন ছাড়া একাধিক বিয়ে করে ওরা মাংসলোভী। ওদের সংসারে

জ্বলে 'হাবিয়ার' আগুন। ওর৷ দুনিয়ায়ও জাহান্নামে জ্বলেপুড়ে ছাই হয়। পরকালেও জ্বলবে। হ্যাঁ এবার বল ডেকেছিস কেন?

তোকে দেখব বলে।

আমাকে কেন? যাকে দিন-রাত দেখছিস, তাকে দেখে মন ভরছে না? অমন সুন্দর সু-পুরুষ যদি আমার ভাগ্যে জুটত, আমি অন্য কারো দিকে মাথা তুলে তাকাতাম না।

তার মানে, তুই কার কথা বলছিস?

আহারে! আর ন্যাকামো করতে হবে না। মেয়েদের এটাই বড় দোষ, পেটে ক্ষিধে মুখে লাজ।

- সত্যি সই, আমি ন্যাকামো করছিনা, বলনা কার কথা বলছিস?

ওঃ আমার মুখে ভালবাসার মানুষটার নাম না শুনলে বুঝি ভাল লাগছে না? যার নাম মেহেদী হাসান, মেহেদীর মতই যার চেহারা গো! সত্যি তুই ভাগ্যবান সই। আল্লাহ বুঝি নিজ কুদরতি হাতে তোর জন্য জোড়া করে ওকে গড়েছেন। শাহিদা হাঁ হয়ে আনোয়ারার কথাগুলো শুনছিল, বলতে পারছিলনা কিছুই। তা দেখে আনোয়ারা বলল, কিরে সই কথা যে বন্ধ হয়ে গেল? এমন সময় নীচে গেটে গাড়ীর হর্ণ শুনে আনোয়ারা বলল, ঐ যে গো এসে গেছে, এখন আর আমার দরকার হবে না, মনপ্রাণ ভরে দেখতে থাক, আমি যাই। বলেই আনোয়ারা সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেল। শাহিদা কিছুই বলতে পারল না। বেলকনিতে বসেই দেখতে লাগল, মেহেদী হাসান গাড়ী থেকে নেমে কোন দিকে না তাকিয়ে সোজা নিজের রুমে গিয়ে ঢুকল। কিন্তু আনোয়ারা এসব কি বলে গেল? যে চিন্তা তার মাথায় কোন দিনই আসে নাই। আনোয়ারা সেই বিষয় এভাবে বলতে পারল কি করে? তবে কি তার কোন ব্যবহারে কোথাও মেহেদী হাসানের প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে পড়েছে? কিন্তু তাইবা কিভাবে সম্ভব! যে বিষয়টি তার নিজের মাথায়ই ছিল না সে বিষয়ে দুর্বলতা অন্যের কাছে ধরা পড়বে কিভাবে? আর যদি তেমন কোন দুর্বলতা প্রকাশ পেতই তাহলে তা প্রথম ধরা পড়ত শামীমা ভাবীর কাছে। কিন্তু কৈ, ভাবীতো তেমন কিছু আমাকে বলেনি কখনো। মেহেদী হাসান ভাই– ভাই হিসাবে ভালবাসতে, শ্রদ্ধা করতে দোষের কিছু নয়। আমি তো তার চেয়ে বেশী কিছু করিনি। হাসিখুশী মানুষটা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে পড়ায় ভেবেছিলাম আমার কোন ব্যবহারে হয়তো ব্যথা পেয়েছে, তাই নিজেকে অপরাধী ভেবে অশ্বস্তি বোধ করছিলাম। কিন্তু তাতো আনোয়ারার জানার কথা নয়। তবে পড়ার ফাঁকে হাসান ভাই কথা

বলত তা আনোয়ারা দেখেছে। আর তাতেই ধরে নিয়েছে আমাদের মাঝে ভালবাসার সৃষ্টি হয়ে গেছে। ভাল লাগা আর ভালবাসা যে এক জিনিস নয়- এই কথাটা ওরা বুঝতে চায় না। শাহিদা মেহেদী হাসানকে নিয়ে আবার নতুন করে ভাবতে শুরু করল। নিজেদের পরিবার ও খানদানের সঙ্গে মেহেদী হাসানের তুলনা করে দেখল! না, আমাদের থেকে কোন অংশেই তারা কম নয়। তাছাড়া আমাদের রক্তের সম্পর্ক আছে তাদের সাথে। তবে অর্থ সম্পদে ওরা অনেক ছোট। কিন্তু অর্থ-সম্পদ তো আদর্শের মাপকাঠি নয়। আভিজাত্যের সাথে অথ-সম্পদের কি সম্পর্ক? অর্থ-সম্পদ দান করার মালিক তো আল্লাহ। আনোয়ারা অনুমানে যে কল্পনার ছবি এঁকেছে তা যদি বাস্তব হয় তাতে অপরাধ কোথায়? মেহেদী হাসান সুন্দর সু-পুরুষ। ভদ্র, নম্র ও মার্জিত রুচির অধিকারী, বর্তমান যামানায় যা অতি দুর্লভ। আনোয়ারা যা অনুমান করেছে তা অত্যন্ত স্বাভাবিক। সুযোগ পেয়ে যারা সুযোগের সদ্ব্যবহার করে না পরে তারাই পস্তায়। কিন্তু! আব্বা কি নীতির কাছে নতি স্বীকার করে ব্যাপারটা মেনে নেবেন? মার তরফ থেকে তেমন বাধা আসবে না। কিন্তু আব্বা কিছুতেই মেনে নেবেন না। তিনি বাধা হয়ে দাঁড়াবেনই। কারণ জমিদারী রক্ত তার দেহে প্রবাহিত। তিনি কিছুতেই চাইবেন না একটি সম্পদহীন পরিবারে তার মেয়েকে তুলে দিতে। তবে ধর্মীয় বিধানে সাবালিকা মেয়ের মতামত স্বীকৃত। এই ধরনের নানা প্রশ্ন ও চিন্তায় শাহিদাকে আচ্ছন্ন করে তুলল। সে যতই ভাবতে থাকল ততই তার মনের মনি কোঠায় মেহেদী হাসানের উপস্থিতি অনুভব করতে লাগল এবং এক মায়াবী স্বপ্নিল আবেশে তাকে জড়িয়ে ফেলল।

ঐ দিন শুক্রবার হওয়ায় হাসান ঢাকাতেই ছিল। শুধু ঐ দিনই নয় প্রতি শুক্রবারই সে ঢাকায় অবস্থান করে থাকে। কারণ শুক্রবার কোল্ড ষ্টোরে মাল দেয়া-নেয়া হয় না। সেদিন বাড়িতে বসেই হিসাবপত্রের খাতাপত্র পরিদর্শন ও ব্যবসা সম্বন্ধে নানা বিষয় নিয়ে খান বাহাদুর সাহেবের সাথে পরামর্শ করে থাকে। মাগরিবের নামাজ আদায় করে শামীমা শাহিদাকে বলল, তুমি হাসান ভাইয়ের চা-টা দিয়ে এস, আমি আব্বা ও মাকে দিয়ে আসছি। শাহিদা কোন প্রতিবাদ না করেই চায়ের কাপ হাতে নিয়ে মেহেদী হাসানের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বলল, ভিতরে আসতে পারি? হাসান বাইরের দিকে পিঠ দিয়ে চেয়ারে বসে কিছু লিখছিল। শাহিদার কণ্ঠ শুনে ফিরে তাকিয়ে মুখে কৃত্রিম হাসি ফুটিয়ে বলল, অনুমতির প্রয়োজন ছিল কি? শাহিদা হাসানের কথার জবাব না দিয়ে তার হাসির জবাবে বলল- যাক, আজ অনেক দিন পর মেঘমুক্ত আকাশ দেখে

ভাল লাগল। বলতে বলতে ভিতরে ঢুকে চায়ের কাপ হাসানের সামনে রেখে তার বিছানায় বসে পড়ল। হাসান চায়ের কাপ হাতে তুলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, মেঘমুক্ত আকাশ মানে বুঝলাম না তো?

বুঝবার চেষ্টা না করলে বুঝবে কি করে?

চেষ্টা করলেই যদি সব কিছু বুঝা যেত তাহলে শিক্ষার্থীরা কাড়ি কাড়ি টাকা প্রাইভেট টিউটরকে দিত না।

আমি তো কোন ছাত্রকে কথাটা বলিনি, বলেছি একজন এম.এ পাস টিউটরকে, যার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সাধারণ টিউটরকেও হার মানাবে।

কিন্তু তোমার কল্পনার সেই জ্ঞানী টিউটরই তো একজন ছাত্রীর কাছে হেরে যাচ্ছে।

- এ হার তার ইচ্ছাকৃত।
- ইচ্ছাকৃত?
- অবশ্যই। যাক সে কথা, কেমন আছেন?
- আল্‌হামদুল্লাহ।

তাহলে মানসিক অশান্তির সেই ভূতটা ঘার থেকে নেমেছে?

- তোমার আজকার কথাগুলো সবই হেয়ালী মনে হচ্ছে।
- ওমা! হেয়ালী আবার করলাম কখন?
- ঐ যে মেঘমুক্ত আকাশ, ঘারের ভূত ইত্যাদি।

না মানে বেশ কিছুদিন মুখের হাসিটা মিলিয়ে গিয়েছিল, আর মনটাও অন্যদিকে ভ্রমণে বেড়িয়েছিল কিনা, তাই বলছিলাম।

ওঃ বুঝতে পেরেছি।

- অনেক দেরিতে।

হ্যাঁ, বুদ্ধিটা একটু মোটা কিনা, তাই। শোন, ওটা ছিল আমার হিকমত।

হিকমত মানে?

মানে কৌশল। তখন যদি ঐ কৌশল অবলম্বন না করতাম তাহলে অত সুন্দরভাবে পরীক্ষা দিতে পারতে না। গল্প করে সময় নষ্ট হতো, পড়া হতো না।

ইজ ইট?

হ্যাঁ, এখন যাও তো অনেকগুলো হিসাব দেখতে হবে।

তাড়িয়ে দিচ্ছেন?

প্রশ্নই ওঠেনা। উত্তরাধিকার সূত্রে এ ঘর-বাড়ির অন্যতম মালিক তুমি, আমি

তাড়িয়ে দেবার কে?

লেবু বেশী চিপলে তিতা হয়, আমি যাই। বলেই শাহিদা বিছানা থেকে নেমে টেবিল থেকে চায়ের কাপ তুলে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। মেহেদী হাসান কিছুক্ষণ দরজার দিকে তাকিয়ে থেকে কাজে মন দিল। কিন্তু হিসাব বার বার ভুল হতে লাগল। মেহেদী হাসান প্রতিজ্ঞা করেছিল, শাহিদা সম্বন্ধে তার মনে যে দুর্বলতার ধুম্রজাল সৃষ্টি হতে যাচ্ছে তা থেকে সে মুক্ত হবে। শাহিদাকে আর কোনভাবেই প্রশ্রয় দেবেনা তার সংস্পর্শে আসার। কিন্তু যখনি সাহিদা এসে তার ঘরে ঢুকল তখনি যেন সব তালগোল পাকিয়ে গেল। কিছুতেই নিজেকে ধরে রাখতে পারল না প্রতিজ্ঞার প্রেক্ষাপটে। প্রতিজ্ঞা ভেঙ্গে কথার পৃষ্ঠে কথা তাকে বলতেই হলো। এটাই বোধ হয় যৌবনের ধর্ম। মেহেদী হাসান আবার নতুনভাবে চিন্তায় জড়িয়ে পড়ল। শাহিদার আজকের কথাগুলো তার কাছে মনে হলো এক অস্পষ্ট ইংগীতের হাতছানী।

[পাঁচ]

আরো কিছু দিন গত হয়। রকিবের ওকালতির পসার বেড়ে যাওয়ায় সে পৃথক চেম্বার খুলে বসেছে। কোর্টের পাশেই একটি ঘর ভাড়া নিয়ে সেখানে সেরেস্তা খুলেছে। রকিবের সিনিয়র তোফাজ্জল সাহেবের সেরেস্তায় এডভোকেট পারভীন কাজ করে। রকিব পৃথক চেম্বার করে সিনিয়রের ওখান থেকে চলে আসার পর একদিন কোর্টে পারভিন রকিবকে বলে, আপনার সেরেস্তায় আমিও বসতে চাই। এখানে আর ভাল লাগছে না। প্রস্তাবটি রকিবের মনে ধরে। সে ভাবে মন্দ কি! সেরেস্তায় পারভীনের মত সুন্দরী এডভোকেট থাকলে মক্কেল বাড়বে। সে রাজি হয়ে যায়। তখন থেকেই পারভীন রকিবের সেরেস্তায় নিয়মিত বসা শুরু করেছে এবং রকিবের উপরও বেশ প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছে। এখন প্রায়ই কোর্ট শেষে পারভীন আর রকিব পার্কে বেড়াতে যায়, কোন দিন রেষ্টুরেন্টে যায় চায়নিজ খেতে। ইদানিং তাই রকিবের বাড়িতে ফিরতে প্রায়ই রাত হয়। শামীমা কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলে, কাজের চাপ তাই দেরি হচ্ছে। শামীমা সরল মনে তাই বিশ্বাস করে; বলে না কিছু। একদিন রকিব কোর্ট থেকে ফিরে শামীমাকে বলল, কাল আমাদের বার লাইব্রেরীতে বাৎসরিক ডিনার পার্টি

আছে। সকলেই তাদের স্ত্রীদের সাথে নিয়ে আসবে। তুমিও তৈরী থেকো। রকিবের কথার জবাবে শামীমা বলল, খোলা জায়গায় অত মানুষের মধ্যে আমি যেতে পারব না।

কিন্তু সকলেই তাদের স্ত্রীদের সাথে নিয়ে আসবে, তুমি না গেলে ওরা আমাকে ঠাট্টা করবে না?

- বলবে তার শরীর খারাপ।

- কিন্তু তোমার এতে আপত্তি কেন? আমি তোমার সাথেই থাকছি। সামাজিকতা বলেও তো একটা কথা আছে।

- দেখ, বড় হবার পর বোরকা ছাড়া আব্বা আমাকে কোন নিকট আত্মীয়ের বাড়িতেও যেতে দেন নাই, আর তোমাদের ঐ সমাজে বোরকা অচল।

- তাহলে তোমাকে দিয়ে সামাজিকতা রক্ষা হবে কিভাবে?

- শরীয়তের বরখেলাফ করে সামাজিকতা রক্ষা করা মুসলমান মেয়েদের জন্য জায়েজ নেই, তুমি আমাকে মাফ কর।

- তাহলে আমার কোন সখ-আহলাদ তোমার দ্বারা পূরণ হবে না?

তুমি কি বৌকে প্রদর্শনী বানিয়ে সখ পূরণ করতে চাও?

- তার মানে? কি বলতে চাও তুমি?

- আমি বলতে চাই, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর বিধান অমান্য করে ডিনার পার্টিতে আমি যেতে পারি না। অন্য যে কোন কথা তুমি বলবে আমি মাথা পেতে নেব।

বেশ, তোমাকে আর কোথাও যেতে বলব না। তুমি তোমার পর্দা নিয়েই থাক।

এ তোমার রাগের কথা। পর্দা যেভাবে করা দরকার আমরা সেভাবে খাস পর্দা করতে পারি না ঐ সামাজিকতার জন্যই। তারপরেও যদি মাঠে-ময়দানে, হাট-বাজারে নিজেকে প্রদর্শন করে বেড়াই তাহলে আল্লাহর দরবারে কি জবাব দেব বলতে পার?

দেখ শামীমা, আমি তোমার স্বামী। স্বামীর আদেশ পালন করা তোমার কর্তব্য।

অবশ্যই। আমি তা অস্বীকার করছিনা। তবে সে আদেশ আল্লাহর আদেশের বিপরীত যদি না হয়।

সেদিন শামীমা আর তর্ক না বাড়িয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যায়। রকিব অগত্য একাই ডিনার পার্টিতে যোগ দেয়। পরের দিন সেরেস্তায় কাজের অবসরে

পারভীন রকিবকে জিজ্ঞাসা করে, কাল ভাবীকে দেখলাম না যে?

আপনার ভাবী এসব পার্টিতে আসা পছন্দ করে না। বিয়ের পরে একদিন সিনেমায় পর্যন্ত তাকে নিয়ে যেতে পারি নাই।

খুব পর্দা করে চলে বুঝি?

আর বলবেন না। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে না পারলে সামাজিকতা রক্ষা করে চলা মুশকিল। আপনার মত আরো কয়েকজন একই প্রশ্ন করেছে। তাদের কাছে বলতে বাধ্য হয়েছি তার শরীর খারাপ।

- এই প্রগতির যুগে স্বামী-স্ত্রী সমান স্মার্ট না হলে সামাজিকতা রক্ষা করে চলা সত্যি মুশকিল। স্বামীর সম্মান রক্ষা করে যে স্ত্রী চলতে পারে না তাকে নিয়ে সংসার করাও তো বিপদ। আপনার দু'চারজন বন্ধু যদি বাড়িতে যায় আর ভাবী যদি তাদের সামনে এসে আপ্যায়ন না করেন তাহলে আপনার মুখ থাকবে কোথায়? বিয়ের আগে মেয়ে সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নেন নাই?

- না, আমি মেয়ে পর্যন্ত দেখতে যাইনি, সবই হয়েছে মা- বাবার পছন্দে।

ওখানেই তো ভুল করেছেন। আপনার আব্বা-আম্মা যে সমাজের মানুষ সে সমাজ এখন অতীত। বর্তমানের সাথে সে সমাজের আর কোন সম্পর্ক নেই। বর্তমান সমাজ হচ্ছে আধুনিক প্রগতিবাদের সমাজ। এ সমাজের বৈশিষ্ট্য হলো, আগে দর্শন পরে বিশ্লেষণ। আগে দেখ, পরে বিচার কর। আমার মতে বিয়ের আগে নারী-পুরুষ যদি উভয়ের ভারসাম্য উভয়ে যাচাই করে নিতে চায় তাতেও দোষের কিছু নেই। হাটে একটি গরু কিনতে গেলেও ঐ গরুর সব কিছু দেখেশুনেই তাকে কেনা হয়।

আপনি ঠিকই বলেছেন। আমারই ভুল হয়ে গেছে মেয়ে না দেখে। রকিবের কথায় পারভীন উৎসাহ পায়। সে বলতে থাকে – আধুনিক বিজ্ঞান যেখানে চাঁদে, মঙ্গল গ্রহে ধাওয়া করছে সেখানে আপনার মত একজন উচ্চ শিক্ষিত যুবকের স্ত্রী ঘুমটা টেনে ঘরের কোণে বসে থেকে পর্দা রক্ষা করবে এতো ভাবাই যায় না। পর্দাতো শরীরে নয়, শরীরটা তো এক খন্ড মাংস বৈ আর কিছু নয়। আসল পর্দা হলো মনে। অন্তরই তো মানুষের আসল সম্পদ। পারভীনের কথা শুনে রকিব হোঃ হোঃ করে হেসে উঠে বলল, আপনি অত সহজে যে কথাগুলো বললেন, অতি কষ্ট করেও আমি তাকে তা বুঝাতে পারিনি।

আপনার আব্বা-আম্মা জানেন ব্যাপারটা?

তারা তাকেই সমর্থন করেন।

তাহলে তো বিপদের কথা। ধর্মান্ধ সমাজের সাথে প্রগতিবাদের আধুনিক

সমাজের এখানেই দ্বন্দ্ব। তবে আমাদের পরিবার ঐসব কুসংস্কার থেকে মুক্ত। সেখানে কারো ব্যক্তি স্বাধীনতায় কেউ হস্তক্ষেপ করে না।

ব্যক্তি স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। তবে পরিবেশ ও মানুষকে প্রভাবিত করে থাকে। আপনি জন্মের পর থেকেই মুক্ত পরিবেশে বড় হতে পেরেছেন এ জন্যই কুসংস্কার আপনাকে স্পর্শ করতে পারেনি। কিন্তু যারা কুসংস্কারের অন্ধকারে জন্মগ্রহণ করেছে তাদের মুক্তির উপায় কি? তারাতো আলোর মুখই দেখেনি।

তারাইতো চাঁদের স্নিগ্ধ আলোকে মনে করে অগ্নিকুন্ড। আপনার জন্য সত্যি দুঃখ হচ্ছে।

- এ দুঃখের শেষ কোথায় বলতে পারেন?

- যার শুরু আছে তার শেষও আছে। আপনি একজন স্বনির্ভর ব্যক্তি। আপনি ইচ্ছা করলেই- এমন সময় মুহুরী সাহেব এসে খবর দিল, স্যার, জজ সাহেব এজলাসে উঠেছেন। রকিব ও পারভীনের আলোচনায় ছেদ পড়ল, তারা উঠে রওনা হলো কোর্টের দিকে। বিকেলে কোর্ট থেকে ফিরে সেরেস্তায় এসে পারভীন রকিবকে বলল, চলেন বস আজ সিনেমা দেখতে যাই, হলে ভাল একটা ইংরেজী বই লেগেছে। অবশ্য আমার সাথে যেতে যদি আপত্তি না থাকে।

না'না, আপত্তি থাকবে কেন। একা একা বই দেখতে আমারও ভাল লাগে না। আপনার ভাবীকে অনেক বলেও রাজী করাতে না পেরে বই দেখাই ছেড়ে দিয়েছি।

- প্রতিজ্ঞা করে বসেননিতো? হাসতে হাসতে বলল পারভীন।

- না-না প্রতিজ্ঞা করিনি। তবে ঐ যে বললাম, একা একা ভাল লাগে না।

- আসলেও তো। বৌ ঘরে থাকতে যদি একা একা সিনেমা দেখতে হয় তাহলে তো দুঃখের কথাই। রকিব আর দেরি করে না। মুহুরী সাহেবকে ডেকে দু'খানা টিকেট আনতে টাকা বের করে পারভীনকে জিজ্ঞাসা করল, কোন শ্রেণী?

- কোন শ্রেণীর দরকার নেই, রিজার্ভ বক্সে কাটতে বলেন, পারভীন বলল।

আমারও ইচ্ছা ছিল তাই। তবে আপনার যদি আপত্তি থাকে, তাই জিজ্ঞাসা করলাম।

আমিতো আগেই বলেছি, আমাদের পরিবার সব রকম কুসংস্কার মুক্ত।
রকিব আর কোন কথা না বাড়িয়ে মুহুরী সাহেবকে টাকা দিয়ে পাঠাল টিকেট কাটতে। তারপর পারভীনকে বলল, শো আরম্ভ হতে এখনো অনেক দেরি,

চলেন কোন রেষ্টুরেন্ট থেকে কিছু খেয়ে আসি।

মন্দ হয় না, চলুন। সেদিন রকিবের বাড়ি ফিরতে রাত দশটা বেজে গেল। শামীমা তখনো রকিবের অপেক্ষায় না খেয়ে বসেছিল। রকিব বাসায় ফিরলে শামীমা পূর্ব অভ্যাস মতই গায়ের কোর্ট খুলে নিয়ে লুঙ্গি ও সেন্ডেল এগিয়ে দিয়ে বলল, তুমি হাত মুখ ধুয়ে এস, আমি খাবার নিয়ে আসি। শামীমার কথায় রকিব বাঁধা দিয়ে বলল, তুমি না খেয়ে থাকলে খেয়ে নাও, আমি রাতে খাব না, খেয়ে এসেছি। রকিবের কথায় শামীমা থমকে দাঁড়ায়। আজই নতুন নয়। ইদানিং মাঝে মধ্যেই রকিব রাতে বাসায় খায় না। জিজ্ঞাসা করলে বলে অমুক বন্ধুর বাসায় দাওয়াত ছিল বা অমুক বন্ধু রেষ্টুরেন্টে নিয়ে খাইয়ে দিয়েছে ইত্যাদি ওজর দেখিয়ে শামীমাকে নিবৃত করে। শামীমা সরল বিশ্বাসে তা মেনে নেয়। কিন্তু আজ কেন জানি তার সন্দেহ হলো স্বামীর উপর। জিজ্ঞাসা করল, আজ আবার কোন বন্ধুর বাড়ি খেতে গিয়েছিলে? শামীমার কথার জবাবে রকিব কিছুটা রাগান্বিত হয়ে বলল, সে কৈফিয়তের তোমার দরকার কি? তোমাকে যা বললাম তাই কর, বলেই রকিব কাপড় বদলিয়ে শুয়ে পড়ল।

স্বামীর সাথে একত্রে বসে খাওয়া স্ত্রীদের জন্য একটা পৃথক আনন্দ। এই আনন্দ প্রাপ্তিটুকুর জন্যই তারা ঘন্টার পর ঘন্টা না খেয়ে স্বামীর অপেক্ষায় বসে থাকে। এই অপেক্ষার যে কষ্ট তা তারা পুষিয়ে নেয় একত্রে আহারের আনন্দের মাধ্যমে। এ বাড়িতে রকিবের সাথে বসে আহারের সুযোগ শামীমার দিনে নেই। কারণ রকিব ন'টায় খেয়ে বের হয়ে যায়। তাই রাতে এক সাথে বসে খাবার জন্য শামীমা স্বামীর পথ চেয়ে বসে থাকে। আজও তাই ছিল। কিন্তু বিনিময়ে স্বামীর যে কণ্ঠ সে শুনল তাতে সে ভবিষ্যত অপেক্ষার আগ্রহ হারিয়ে ফেলল, কিন্তু ধৈর্য হারালো না। সে খাবার ঘরে গিয়ে ঢুকল। শামীমা সিদ্ধান্ত নিল, শাশুড়ীকে সব খুলে বলবে। এত দিন যে ঘটনাগুলো স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঘটে গেছে তার কিছুই সে কাউকে বলে নাই। দু'জনের মধ্যেই তা ছিল সীমাবদ্ধ। কিন্তু দিন দিন রকিবের এই পরিবর্তন শামীমাকে শংকিত করে তোলে। সে বুঝতে পারে কোথায় যেন কি একটা ঘটতে যাচ্ছে। কারণ স্ত্রীর প্রতি স্বামীর সেই আদর, ভালবাসা যেন অনেক কমে গেছে। শামীমা কিছুতেই হিসাব মিলাতে পারছে না, কেন এমন হলো? শামীমাকে ডিনার পার্টিতে যেতে বলেছিল, কিন্তু সেই শিক্ষায় তো সে গড়ে ওঠেনি। আর সিনেমা, সেত আরো জঘন্য ব্যাপার। এই দু'টিতে যেতে সে অস্বীকার করায় তার অপরাধ কোথায়? আমাদের পরিবারের সব খবর নিয়েই তো তারা আগ্রহ দেখিয়েছিল। সেদিন

সারা রাত সে এই সব চিন্তা করে কাটিয়ে দেয়। রাতে ঘুম না হবার কারণে এবং বেদনাশ্রু পড়ার জন্য তার দু'টি চোখ জবাফুলের মত লাল হয়ে ওঠে। চোখ-মুখ কেমন ফুলাফুলা মনে হয়। শাহিনা বেগমের দৃষ্টিতে তা এড়ায় না। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, কিরে শামীমা, তুই রাতে ঘুমাসনি?

ঘুমিয়েছিতো?

তাহলে তোর চোখ-মুখ ফুলা কেন, আর চোখইবা এত লাল কেন?

ও কিছু না মা' চোখে পোকা ঢুকেছিল- তাই। শামীমা ব্যাপারটি এড়িয়ে যায়। ভাবে আরো কয়েক দিন দেখা যাক না।

কিন্তু আমার মনে হচ্ছে তুই কিছু লুকাচ্ছিস। সত্যি করে বল কি হয়েছে? রকিব কিছু বলেছে? ও আজকাল প্রায়ই দেরি করে বাড়িতে ফেরে। আমি সবই টের পাই। আমার মন বলছে, তোদের স্বামী-স্ত্রীতে কিছু হয়েছে। আমি তোর মা, আমার কাছে কিছু না লুকিয়ে বলত মা, রকিব তোকে কি বলেছে?
এবার আর শামীমা নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। সে ঢুকরিয়ে কেঁদে ওঠে। শাহিনা বেগম শামীমাকে কাছে টেনে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেন, কাঁদিসনে মা, আমাকে সব কথা খুলে বল, তোর মত সোনার প্রতিমাকে যে কাঁদাবে তাকে আমি ছেড়ে দেব ভেবেছিস? তাকে আমি এমন শাস্তি দেব, চির দিন তা মনে রাখবে। শাহিনা বেগম শামীমাকে ধরে নিয়ে নিজের ঘরের দিকে রওনা হলেন।

[ছয়]

সেদিন মেহেদী হাসানকে চা দিতে গিয়ে তার সাথে কথা বলে আসার পর শাহিদা রাতে শুয়ে শুয়ে আবারও নিজেকে নিয়ে চিন্তায় মগ্ন হয়। সে যতই চিন্তা করতে লাগল ততই হাসানের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকল। ভাবতে লাগল, আনোয়ারা দূরে থেকে যে রকম আবিষ্কার করেছে আমি পাশে থেকেও সেই রত্নের প্রতি খেয়াল করে তাকিয়ে দেখিনি। যেভাবেই হোক একে আটকাতেই হবে, আর অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে আমাকেই। কারণ হাসান ভাইয়ের তরফ থেকে কোন আহবান আশা করা যায় না। ভাল মানুষ হবার বিপদ এখানেই। আনোয়ারা ঠিকই বলেছে, বর্তমান ভেজালের দুনিয়ায়

খাঁটি সোনা পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। আনোয়ারা আমার চোখ খুলে দিয়েছে। সে বিছানা থেকেই উঠে কাগজ-কলম নিয়ে চিঠি লিখতে বসে। কারণ চিঠিতে যে কথাগুলো সহজে বলা যায়, সামনে সে কথাগুলোই মুখ থেকে শত চেষ্টা করেও বের করা যায় না। সে লিখল ঃ

শ্রদ্ধেয় হাসান ভাইজান,
আমার ভক্তিপূর্ণ সালাম নিবেন। অনেক চেষ্টা করেও মুখ ফুটে মনের কথা বলতে না পেরে চিঠির আশ্রয় নিলাম। আমি চিন্তা করে দেখেছি আপনার সামনে অনেক বিধি সংকোচ তাই আমাকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হলো। হাসান ভাই পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষ আছে, কিন্তু একটি মানুষ শুধু একটি মানুষের দিকেই তাকিয়ে থাকে, সেই মানুষটিকেই বলে মনের মানুষ। আর মন এমনি বেয়াড়া যে, ঐ মানুষটি ছাড়া আর কোথাও তার দৃষ্টিশক্তি নিবদ্ধ হয় না। আমার হৃদয়ের আরসীতে একটি মানুষ ধরা পড়েছে, আর তারই অনুগ্রহের প্রার্থিনী হয়ে একথাগুলো বলতে হলো। আশাকরি বিজ্ঞ ব্যক্তিকে এর চেয়ে বেশী বলার প্রয়োজন নেই।

ইতি- সেবিকা ইচ্ছুক, শাহিদা।

পরের দিন রাতের আহার শেষে মেহেদী হাসান নিজের রুমে ঢুকে একখানা মাসিক পত্রিকা হাতে নিয়ে পাতা উল্টাতেই দেখে একখানা ভাজ করা কাগজ। কাগজখানা খুলে পড়তেই হাসান বুঝতে পারে সব। সেই সাথে শাহিদার গতকালের হেয়ালীপূর্ণ কথাগুলো তার মনে পড়ে যায়। হাসান বুঝতে পারে না সে কি করবে। শাহিদার মত গুণবতি রূপবতী মেয়ে যে কোন পুরুষের জন্যই স্ত্রী হিসেবে পাওয়া ভাগ্যের কথা কিন্তু সেখানে যে বিরাট ব্যবধান বিরাজ করছে। এই ব্যবধানের সমন্বয় কিভাবে সম্ভব? খালুজান কখনি এই অসম বিবাহ মেনে নেবেন না। আর তার বিপরীত বিকল্প যে রাস্তা আছে, সে কথা চিন্তা করতেও হাসান শিউরে ওঠে। সে স্থির করল এ বিষয় নিয়ে সাহিদার সাথে খোলাখুলি কথা বলা দরকার। কারণ এখনো সময় আছে। পরে বেশী জড়িয়ে পড়লে তখন আর ফেরার পথ থাকবে না। আর তাতে উত্থান অথবা পতন দুটির সম্ভাবনা থাকলেও পতনের সম্ভাবনাই বেশি। কারণ দুর্বল চাপের মধ্য মুখে নতি স্বীকার করতে বাধ্য। আর তাই যদি হয় আমাকে সাগরে ভাসা ছাড়া কোন উপায় থাকবে না। পরের দিন হাসান মাগরিবের আগেই বাসায় ফিরল। খান বাহাদুর সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, আজ এত সকালে এলে যে- পেট্রোল পাম্পে যাও নাই? খান বাহাদুরের প্রশ্নের জবাবে হাসান বলল,

গিয়েছিলাম। শরীরটা ভাল না এ জন্য চলে এলাম। খান বাহাদুর সাহেব ব্যস্ত হয়ে বললেন, শরীর ভালনা, ডাক্তার দেখাওনি? হাসান বলতে বলল, না, তেমন কিছুই না, বিশ্রাম নিলেই ঠিক হয়ে যাবে।
– তাহলে তাই কর। ঘরে গিয়ে শুয়ে থাক, বললেন খান বাহাদুর সাহেব। হাসান ঘরে গিয়ে কাপড় পাল্টে নামাজ পড়তে মসজিদে চলে গেল। শাহিদা দোতলা থেকে তা দেখে কিছুটা অবাক হলো। কারণ সাধারণতঃ হাসান এ সময় বাসায় ফেরে না। সে ভাবতে লাগল, তাহলে তার ওষুধ কি রোগ ধরতে পেরেছে? মনে মনে খুশী হলো শাহিদা । সে তাড়াতাড়ি ওজু সেরে নামাজ আদায় করতে চলে গেল। নামাজ পড়ে শাহিদা আবার বেলকনিতে এসে দাঁড়ায়। ওর ইচ্ছা হাসান ফেরা মাত্র সে চা দিবার অছিলায় হাসানের ঘরে গিয়ে তার চিঠির প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করবে। শাহিদা যখন দেখল হাসান এসেছে তখনি শামীমার কাছে গিয়ে বলল– ভাবী, হাসান ভাই এসেছেন, তার জন্য চা নিয়ে তুমি যাবে, না আমাকে যেতে হবে?
–তুমিই নিয়ে যাও। আমি মা ও আব্বার ঘরে দিয়ে আসব। ঠিক তখনি হাসানের গলা শুনা গেল। হাসান শামীমাকে ডেকে বলল– ভাবী, কড়া করে এক কাপ চা পাঠান। বলেই সে ঘরে গিয়ে ঢুকল। এর কিছুক্ষণ পরই চায়ের কাপ হাতে শাহিদা ঘরে প্রবেশ করে মুচকি হাসল। তারপর চায়ের কাপ টেবিলে রেখে বলল, আপনিতো শুক্রবার ছাড়া এ সময় বাসায় ফেরেন না। আজ হঠাৎ তার ব্যতিক্রম মনে হচ্ছে।
–ব্যতিক্রম বলে যখন কিছু আছে তখন তা হতেই পারে।
– তা হতে পারে। তবে তার পিছনে কারণ থাকে।
– হ্যাঁ, কারণ অবশ্যই থাকে। আর সে কারণ আমার ধারণা বিজ্ঞ প্রশ্নকারিনী জ্ঞাত আছেন।
– বারে, আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার আমি জানব কিভাবে?
– যেভাবে একজনের মনের কথা আর একজনের মনের আয়নায় ধরা পড়ে?
– আজ কিন্তু আপনিই হেয়ালী শুরু করলেন।
হাসান কাপের চা শেষ করে কাপ টেবিলে রেখে বলল, যাক ওসব হেয়ালীর কথা। শাহিদা শোন, তুমি যে পথে পা বাড়িয়েছ তার শেষ কোথায় জান?
– জানি।
– কোথায়?
–মঞ্জিলে মকসুদে।
তার নিশ্চয়তা?

–আত্মবিশ্বাস।
– এ আত্মবিশ্বাসের উৎস কোথায়? মনও অনেক সময় বিদ্রে করে।
– হাসান ভাই, একটি মেয়ের সুখী জীবনের জন্য তার পিতা-মাতার যে বিষয়গুলো দেখার কথা, আমি জানি তার ইতিবাচক সব গুণগুলোই আপনার মধ্যে বিদ্যমান। শুধু অস্থায়ী একটি বিষয়ে আপনি দুর্বল, তা হলো সম্পদ। একটি মেয়ের সুখী জীবনের জন্য সম্পদ মুখ্য বিষয় নয়। মুখ্য বিষয় হলো, ব্যক্তির পবিত্রতা, কর্ম দক্ষতা ও শিক্ষাগত যোগ্যতা।
– শাহিদা, নিঃসন্দেহে তুমি বুদ্ধিমতি, কিন্তু আমার ভয় হয় খালুজান যদি সম্পদকেই মুখ্য বিষয় গণ্য করে বসেন তাহলে কি হবে?
– ও দিকটা আমি সামলে নেব। আমার আব্বাকে আমি চিনি। তিনি অত কঠোর হবেন না।
– যদি হন, তখন কি হবে।
– তেমন ঘটনা যদি ঘটেই যায়, আর কিছু না পারলেও জীবনটাতো দিতে পারব?
– শাহিদা!
– হ্যাঁ, এটাই আমার শেষ কথা।
– ওটাতো সুষ্ঠু সমাধানের পথ নয়। ওতে আরো বেদনা বেড়ে যাবে।
– তাহলে আপনিই বলে দিন আমি কি করব?
– তক্‌দিরকে মেনে নিয়ে অগ্রসর হতে হবে। বিশ্বাস রাখতে হবে আল্লাহ জোড়া সৃষ্টি করেছেন, সেই জোড়া একত্রে করে মিলন ঘটানও আল্লাহরই এক্তিয়ারে। তুমি আমি চেষ্টা করতে পারি, কিন্তু আল্লাহর বিধান লংঘন করার ক্ষমতা আমাদের নেই। তাই আবেগের বশবর্তী হয়ে কোন কিছু করা ঠিক হবে না।
– বেশ, তাই হবে। তবে আপনাকে কথা দিতে হবে আপনি আমাকে– হাসান বাধা দিয়ে বলল,
– শাহিদা শোন। মনের অজান্তেই তোমাকে আমি ভালবেসে ফেলেছি। সব সময় অপেক্ষায় থাকতাম কখন সময় আসবে সান্নিধ্য লাভের সেই মুহূর্তটি। তোমাকে পড়াতে আসতাম শুধু পড়াবার জন্যইই নয়– তোমাকে দেখা, তোমার সঙ্গে কথা বলে সময় কাটানোও ছিল অন্যতম উদ্দেশ্য। তারপর হঠাৎ একদিন আমার মোহ ভঙ্গ হলো। চিন্তা করলাম, আমি যে পথে পা বাড়াতে যাচ্ছি সে পথে হাঁটা-তো আমার জন্য শোভন নয়। খালুজান কিছুতেই মেনে নেবেন না। তাছাড়া তুমি যে মেনে নেবে তারই বা নিশ্চয়তা কি? যদি

এদিকগুলো ইতিবাচক না হয়ে নেতিবাচক হয় তাহলে আমার ভবিষ্যতই শুধু ধ্বংস হবে না, চরিত্রহীনতার কলংক মাথায় নিয়ে আমাকে এ বাড়ী থেকে বিদায় নিতে হবে।

– তাই বুঝি আমার সাথে কথা বলা বন্ধ করে এড়িয়ে চলতেন?

–ঠিক তাই। ভেবেছিলাম মন থেকে সব দুর্বলতা মুছে ফেলব।

– এখন? এখনো কি পারবেন দূরে সরে থাকতে?

–বিপদতো ওখানেই দেখা দেবে। নিয়মের ব্যতিক্রম হলে অন্য কারো চোখে ধরা না পড়লেও ভাবীর চোখকে ফাঁকি দেয়া কঠিন হবে।

– ভাবিকে ফাঁকি দিয়ে এ বাড়ীতে কিছুই করা যাবে না। তবে আমার বিশ্বাস ভাবীকে আমি ম্যানেজ করতে পারব। ভাবী অত্যন্ত বুদ্ধিমতি ও জ্ঞানী। তাকে সব বললে তার সহযোগিতা আশাকরি আমরা পাব। অনেক দেরি হয়ে গেল, শুক্রবার আবার দেখা হবে। শাহিদা চায়ের কাপ নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। হাসান নতুন আমেজে কল্পনার জাল বুনতে বুনতে বিছানায় গা এলিয়ে দিল। এরপর থেকে হাসান ও শাহিদার মধ্যে দূরত্বের ব্যবধান কমতে থাকে এবং ধীরে ধীরে একে অপরের অন্তরের সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ে।

সেদিন শাহিনা বেগম শামীমাকে নিজের ঘরে নিয়ে তার কাছে সব শুনে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়েন। এ বংশের কোন বৌ-বেটি সিনেমা, ক্লাব বা কোন পার্টিতে বেপর্দা হয়ে যোগদানের কথা কোন দিন চিন্তাও করতে পারেনি। ঠিক তেমনি আর একটি পরিবারের সাথে ছেলের বিয়ে দিতে পেরে তারা নিজেদের ভাগ্যবান মনে করে থাকে। বিশেষ করে ছেলের মনের মত বৌ পেয়ে তারা মহা খুশী। এমন মার্জিত রুচির, ধার্মিক ও কর্মঠ মেয়ে এ যুগে সত্যি বিরল। আর তারই ছেলে বৌকে পার্টিতে, সিনেমায় নিতে প্ররোচনা যুগিয়ে বংশের মর্যাদা ধুলায় মিশিয়ে দিতে চায়। তিনি সব শুনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, এখনি এই শয়তানের প্রবণতার মূল উৎপাটন করতে না পারলে একদিন এই বংশের ঐতিহ্যই হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়বে। তিনি শামীমাকে শান্ত্বনা দিয়ে বললেন– তুই কোন চিন্তা করিস না মা, আমি আজই তোর আব্বাকে বলে এর প্রতিকারের ব্যবস্থা করব। শাহিনা বেগমের কথা শুনে শামিমা ভয় পেয়ে যায়। তার শশুর খান বাহাদুর অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ ধার্মীক লোক। এসব কথা শুনে হয়তো তিনি রেগে গিয়ে কিছু একটা করে বসতে পারেন। স্বামীকে গালাগালি করতে পারেন। যার পরিণাম আরো বেশী অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই শামীমা বলল, এখনি এসব কথা কি আব্বাকে বলা ঠিক হবে– মা?

– রোগের শুরুতেই ডাক্তার দেখান আবশ্যক। পুরানো হলে জটিল আকার ধারণ করে। তোকে কোন চিন্তা করতে হবে না। যা করবার আমিই করব। তুই যা তোর কাজ দেখ গিয়ে। শাহিনা বেগম শামীমাকে বিদায় করে দিয়ে খান বাহাদুর সাহেবের ঘরের দিকে রওয়ানা হলেন। খান বাহাদুর সাহেব ঘরেই ছিলেন। শাহিনা বেগম শামীমার মুখে শোনা ঘটনাগুলো সবিস্তারে সবই বর্ণনা করে শোনালেন স্বামীকে। খান বাহাদুর সাহেব স্ত্রীর মুখে সব শুনে কিছুক্ষণ নীরবে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। সহসাই কোন কথা বলতে পারলেন না। তিনি তার ছেলে সম্বন্ধে যা কোনদিন কল্পনা করতে পারেন নাই, আজ তাই বাস্তবে ঘটতে যাচ্ছে শুনে তিনি স্তম্ভিত হয়ে পড়লেন। শুধু বললেন, আমি রকিবের জন্য চিন্তা করি না। মূর্তিকারক আজরের ঘরে যেমন আল্লাহর খলিল ইব্রাহীম (আঃ)-এর জন্ম হয়েছিল, তেমনি আবার মানব শ্রেষ্ঠ আল্লাহর হাবীব (সাঃ)-এর বংশেই জন্ম হয়েছিল আবু জেহেল আবু লাহাবের মত আল্লাহর দুশমনদের। কিন্তু আমি উৎকণ্ঠিত বৌমার জন্য। তুমি আজ রকিব এলে আগে তাকে এই ঘটনাগুলো সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কর, শোন সে কি বলে। আমি একটা অশুভ ইংগীতের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। নিশ্চয়ই এর পিছনে অন্য কোন কারণ নিহিত আছে।

আজ রকিব সন্ধ্যার পর পরই বাড়ী ফিরেছে। বাড়ি ফিরে হাত-মুখ ধুয়ে বসতেই মা শাহিনা বেগম কাজের মেয়েটিকে দিয়ে রকিবকে ডেকে পাঠালেন নিজের ঘরে। রকিব ঘরে গিয়ে ঢুকতেই শাহিনা বেগম বললেন, বস, তোর সাথে কিছু কথা আছে। মায়ের নির্দেশে রকিব একটি চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। শাহিনা বেগম বললেন, আমি শুনলাম বেশ কিছুদিন থেকে তুই শামীমার সাথে খারাপ ব্যবহার করছিস।

– শুধু আমি খারাপ ব্যবহার করছি তাই শুনেছ, তার কারণ কিছুই শোননি?

– হ্যাঁ, তাও শুনেছি। তুই বৌকে নিয়ে ডিনার পার্টিতে, সিনেমায় যেতে চাস, আর সে যেতে চায় না এটাইতো কারণ, না অন্য কিছু?

– তুমি ঠিকই শুনেছ। আজকাল শিক্ষিত সমাজে সামাজিকতা রক্ষা করে চলার জন্য আমার ঐ চাওয়া কি খুব অন্যায় হয়েছে?

– তুই বলিস কি খোকা? এ বাড়ির কোন বৌ-বেটিকে কি কোন দিন দেখেছিস বাইরে হাট-বাজারে ঘুরা-ফেরা করতে? তুই যদি তোর বৌকে নিয়ে পার্টিতে যাস, সিনেমায় যাস, তাহলে তোর বাপ সমাজে মুখ দেখাবে কিভাবে? তা-কি একবার ভেবে দেখেছিস?

– মা, আব্বা বা তুমি যে যুগের মানুষ সে যুগ এটা নয়। এটা আধুনিক-প্রগতির

যুগ, এ যুগে কেউ ঘরে বসে থাকেনা। বেঁচে থাকতে হলে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। আর সেটাই যুগের ধর্ম।
– তোর এ থিউরী শয়তানের থিউরী। মুসলমানদের দেড় হাজার বছর আগে যে যুগ শুরু হয়েছে সেই যুগ একইভাবে চলবে রোজ কিয়ামত পর্যন্ত। এতে কোন পরিবর্তন হবেনা। প্রগতির নামে দেশে যে উলংগপনা চলছে, তুই কি তোর বৌকেও সেই বেলেল্লাদের কাতারে নিয়ে দাঁড় করাতে চাস?
–মা, তোমার সাথে আমি তর্কে জড়াতে চাইনা। তবে শুনে রাখ, আমারও একটা সমাজ আছে, আর সে সমাজের কিছু চাহিদাও আছে। তুমি এমন মেয়েকে বৌ করে এনেছ যাকে দিয়ে দু'জন বন্ধু-বান্ধব বাড়ীতে আসলে তাদের আপ্যায়ন পর্যন্ত করান সম্ভব নয়। অথচ আমি যখন তাদের বাসায় যাই তখন তারা আমাকে কত আন্তরিকতার সাথে খাতির-যত্ন করে থাকে।
– বন্ধুর বৌকে দিয়ে খাতির-যত্ন নেয়া এবং নিজের বৌকে দিয়ে বন্ধুর খাতির-যত্ন করানো সরাসরি শরীয়ত বিরোধী কাজ। বন্ধুকে খুশী করার জন্য আল্লাহকে যে অসন্তুষ্ট করে সেত মুসলমানই নয়। এ বাড়ীতে ঐসব শরীয়ত বিরোধী আচার-আচরণ চলবে না। অন্ততঃ যতদিন আমরা বেঁচে আছি।
–ঠিক আছে, তোমার ঐ আদরিনী বৌকে আমি আর কখনো কোথাও যেতে বলব না। তুমি তাকে শো-কেসে উঠিয়ে রাখ। বলেই রকিব ঘর থেকে বের হয়ে সোজা নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। রাতে শামীমা অনেক সাধাসাধি করেও কিছু খাওয়াতে পারল না। ঐ রাতে শামীমারও খাওয়া হলোনা। কিন্তু পরের দিন কোর্ট থেকে ফেরার পর দেখা গেল পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। রকিবের আচার-ব্যবহার স্বাভাবিক হতে দেখা গেল। ঠিক যেন বিয়ের পরের মতই। শামীমা স্বামীর এই পরিবর্তনে খুশী হলো। শাহিনা বেগম ও খান বাহাদুর সাহেব শুনে আল্লাহর শুকুর গোজার করলেন। বাড়ীতে যেন আবার পূর্বের শান্তি ফিরে এলো, সকলেই নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল।
এর এক সপ্তাহ পর। একদিন রকিব কোর্ট থেকে বাসায় ফিরে স্ত্রী শামীমাকে বলল, আমার কিছু কাপড় গুছিয়ে স্যুটকেসে ভরে রাখ, আমি একটা সেশন মামলায় সিনিয়রের সাথে ঢাকার বাইরে যাব, ফিরতে সপ্তাহখানেক লেগে যেতে পারে। শামীমা স্বামীর নির্দেশ মত সবকিছু গুছিয়ে স্যুটকেসে ভরে দিল। পরের দিন গাড়ীর চাবি শামীমার হাতে দিয়ে খান বাহাদুর ও শাহিনা বেগমকে বলে রকিব রওয়ানা হয়ে গেল। যাবার সময় রকিব শামীমাকে বলল, তুমি ইচ্ছা করলে এরমধ্যে তোমার মার ওখান থেকে বেড়িয়ে আসতে পার। শামীমা জবাবে বলল, তুমি ঘুরে এস, তারপর এক সাথে যাব। ওকালত পেশায় ঢাকার

উকিলদের প্রায়ই এভাবে বাইরে যেতে হয়, তাই এতে কারো কিছু মনে করার থাকে না। রকিবের বাড়ীরও কেউ কিছু মনে করল না।
রকিব চলে যাবার পর শামীমা শাহিদাকে বলল, আজ থেকে তোমার ভাইয়ের বদলে তুমি আমার সাথে রাতে ঘুমাবে।
– তা না হয় ঘুমাব, কিন্তু ভাইজানের বদলে মানে? আমাকে কি ভাইজানের প্রক্সি দিতে বলছ? মুচকি হেসে বলল শাহিদা। শামীমা শাহিদার গাল টেনে দিয়ে বলল, দুষ্ট কোথাকার। ক্ষমতা থাকলে দেবে প্রক্সি। সেদিন অর্ধেক রাত দু'জন নানা ধরনের গল্প করে কাটাল। কিন্তু বার বার বলতে গিয়েও যে কথাটা শাহিদা বলতে পারল না তাহলো মেহেদী হাসানের কথা। যখনি বলতে চায় তখনি লজ্জা ও সংকোচে আর বলতে পারে না। সেদিন ঐভাবেই রাত কেটে গেল। পরের দিন শুক্রবার হওয়ায় সন্ধ্যায় মেহেদী হাসান ঘরেই ছিল। অন্য দিনের মত শাহিদা চায়ের কাপ হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকেই বলল, প্রতীক্ষার দিন বড় লম্বা হয় তাই না?
– হ্যাঁ, এক একদিন মনে হয় এক এক বছর। এক সাথে উভয় হেসে উঠল– কিন্তু এ প্রতীক্ষার শেষ কবে হবে? বলল শাহিদা।
– শেষ হয়তো একদিন হবে। তবে সে শেষের ধরন কি হবে সেটাই বিবেচ্য বিষয়। তুমি কি ভাবীকে কিছু বলেছ?
– না, এখনো কিছু বলিনি। কাল ভাবীর সাথে রাত কাটিয়েছি, কিন্তু বলতে পারিনি লজ্জায়।
–কিন্তু লজ্জাকে তো জয় করতে হবে।
– হ্যাঁ, এটাই সুযোগ। এই সুযোগে ভাবীকে ম্যানেজ করতে না পারলে ভাইজান ফিরে এলে আর হবে না। আমি আজ রাতে আবার চেষ্টা নেব।
–কিন্তু আমি তো এক সপ্তাহের আগে রেজাল্ট জানতে পারব না।
– কেন, তার আগে শরীর খারাপ বা মাথা ব্যথা হবে না কি? হেসে বলল শাহিদা।
– ঘন ঘন শরীর খারাপ হলে খালুজান মেডিক্যালে ভর্তি করিয়ে ছাড়বেন।
–ঠিক আছে, চিন্তার কারণ নেই। আমি লিখে আপনার টেবিলে রেখে আসব। কিন্তু ভাবীর সামনে কথাটা তুলব কিভাবে তাইতো ভেবে পাচ্ছি না।
– কেন, যা ঘটনা তাই বলবে।
– পাগল! আগে তার মনোভাব না বুঝে সরাসরি ঘটনা বলে বিপদ ডেকে আনব নাকি? আগে তার মতামতটা জানতে হবে না?
–ইয়েস, এ জন্যই তো তোমার বুদ্ধির তারিফ করি।

–থাক আর বুদ্ধির তারিফ করতে হবে না, ওটা আমিই ম্যানেজ করে নেব। আমি এখন যাই।
– আর একটু বস না।
– কি হবে বসে?
–কিছুই হবে না। তবু তুমি সামনে থাকলে ভাল লাগে।
–ক্ষনিকের ভাল লাগায় তৃপ্তি কোথায়? আরো জ্বালা বাড়িয়ে দেয়।
–ঐ জ্বালার নামইতো প্রেম। আল্লাহর প্রেমিকদের জ্বালা আরও বেশী, আরো তীব্র।
হ্যাঁ, তোমার পরীক্ষার রেজাল্ট না কবে?
–আগামী মাসে হবার কথা। আচ্ছা, খোদা হাফেজ।
ঐদিন রাতেই শামীমা ও শাহিদা বিছানায় শুয়ে গল্প শুরু করল। গল্পের এক ফাকে শাহিদা শামীমাকে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা ভাবী, হাসান ভাইজান সম্বন্ধে তোমার ধারণা কি?
–হাসান ভাইজান সম্বন্ধে নতুন করে এ জিজ্ঞাসার কারণ কি?
–না, কারণ কিছু নেই, এমনি জিজ্ঞাসা করলাম।
–শোন, হাসান ভাইজানের মূল্যায়ন এ সমাজে হওয়া দুষ্কর। আধুনিক প্রগতিবাদী সমাজে তার মত উচ্চ শিক্ষিত একজন যুবক এত নির্মল চরিত্রের হতে পারে তা কল্পনাও করা যায়না। যারা হীরা চিনে তারাই কেবল বুঝবে হাসান ভাইজানের কদর। হঠাৎ হাসান সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় শামীমার খেয়াল হয় শাহিদা আজকাল হাসান ভাইজানের ঘরে চা দিতে গিয়ে অনেক দেরিতে ফেরে। তাহলে কি শাহিদা হাসানের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছে? তাই হবে। ব্যাপারটি উদ্ধার করার জন্য শামীমা শাহিদাকে জিজ্ঞাসা করে, হাসান ভাইজান সম্বন্ধে যে প্রশ্ন আমাকে করলে সেকি শুধুই কৌতূহল না অন্য কিছু?
–অন্য আর কি হতে পারে বলে তোমার ধারণা?
–তোমার মত সুন্দরী যুবতী মেয়ে যখন কোন বিশেষ বিশেষ গুণের অধিকারী কোন সুন্দর যুবক সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ করে তখন ঐ কৌতূহলকে শুধুই কৌতূহল বলে উড়িয়ে দেয়া যায় না– আমার ননদিনী। কি তাহলে– শামীমাকে কথা শেষ করতে দেয়না, শাহিদা হাত দিয়ে তার মুখ চেপে ধরে। এবার শামীমার কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যায়। সে জিজ্ঞাসা করে, এই পদক্ষেপ এক তরফা না দু'তরফা? শাহিদা ভাবীকে জড়িয়ে ধরে বলে, জানিনা। শামীমা শাহিদার বাহু পাশ থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করে বলে, তা আমাকে জড়িয়ে ধরছ কেন? জড়িয়ে ধরার মানুষতো যোগাড় করেই ফেলেছ। পরিণাম শুভ হলে

সত্যি তুমি হবে ভাগ্যবতী।
–পরিণাম শুভ মানে?
– মানে যদি কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না হয়।
–এ বাধা কোন দিক থেকে আসতে পারে বলে তোমার ধারণা?
–বাধা আসলে তো আব্বার তরফ থেকেই আসবে।
– আমারও তাই মনে হয়। তবে যত বাধাই আসুক সে বাঁধা তোমাকেই ঠেকাতে হবে।
–আমাকে? আমি কিভাবে ঠেকাব?
– তা জানিনা।
–বা-রে, দুধ খাবে একজন আর গরুর লাথি খাবে আর একজন। আজব দুনিয়ারে বাবা। যে বুঝা বইতে পারবে না সে বোঝা ঘাড়ে নিলে কেন?
–তোমার ভরসায়। আমি জানি এ বোঝা একমাত্র তুমিই গন্তব্যে পৌঁছে দিতে পারবে।
–দেখ, এ ব্যাপারে আমি তোমাকে কতটুকু সাহায্য করতে পারব তা এখনি নিশ্চিত করে বলতে পারছিনা। তবে আমি চাই তুমি সফল হও। তা এ খেলা কবে শুরু করেছ?
–খুব অল্প দিন। তুমি কিন্তু এখনি হাসান ভাইকে কিছু বলো না।
– কেন, হাত ছাড়া হবার ভয় আছে নাকি?
– না, মানে লজ্জা পাবে।
– হাটে গিয়ে ঘুমটা দিয়ে লাভ আছে?
– তবু তুমি এখনি কিছু বলোনা।
– আচ্ছা গো আচ্ছা, বলব না। শামীমা শাহিদার থুতনী নেড়ে বলল, এতে সাহিদা খুশী হয়ে ভাবীকে আরো জোরে চেপে ধরল।
পরের দিনই খান বাহাদুরের বন্ধু শরিফুল ইসলাম এসে হাজির হলেন। তিনি এসেছেন সেই বিয়ের কথা নিয়ে। খান বাহাদুর সাহেব শরিফুল ইসলামকে দেখে কিছুটা লজ্জিত হয়ে বললেন, তোমার বাসায় আমারই যাবার কথা ছিল। অথচ আমি আমার কথা রাখতে পারিনি। শরিফুল ইসলাম বললেন, না গিয়ে ভালই করেছ। তোমার সাথে দেখা হবার দু'দিন পরই ব্যবসা সংক্রান্ত একটা জরুরী কাজে আমাকে সিংগাপুর যেতে হয়েছিল। গত পরশু ফিরেছি। ফিরেই ভাবলাম তোমার সাথে দেখা করার দরকার, তাই চলে এলাম।
– ভালই করেছ, আমি তোমার প্রস্তাব তোমার ভাবীকে ঐদিনই জানিয়েছি।
–কি বলেছেন তিনি?

– না করে নাই, তবে তখন মেয়ের পরীক্ষা সামনে থাকায় ব্যাপারটা নিয়ে পরে আলোচনা করবে বলে জানিয়েছিল।
–তুমি পরে আর কথা বলোনি?
–না, আর কথা বলিনি, তবে না করবেনা বলেই আমার ধারণা। হ্যাঁ, তোমার ছেলের নামটা যেন কি?
–তরিকুল ইসলাম।
–সুন্দর নাম। দেশে এসে এখন কি করছে?
–ওতো লন্ডনে ভাল একটা চাকুরি পেয়েছিল। কিন্তু এক বছর চাকরি করার পরই চাকরি ছেড়ে দেশে এসে বলল, চাকুরি ভাল লাগে না। আমিও আর চারদিক সামলাতে না পেরে ওকে ব্যবসায় লাগিয়ে দিয়েছি।
–খুবই ভাল করেছ। তোমার ভাবী বলছিল, মেয়ে আমাদের পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, মোটামুটি ধর্মীয় বিধি-বিধান মেনে চলে, আর ছেলে বিলেত ফেরত। ওদের বিয়ে হলে মতানৈক্যের কোন সম্ভাবনা আছে কি না?
–মোটেও না। আমার বাড়ীর পরিবেশতো তোমার অজানা নয়। আর ছেলেও পুরোপুরি ইসলামিক মাইন্ডেড। মতানৈক্যের কোন প্রশ্নই নেই।
–তোমার কোন দাবী আছে নাকি আবার?
–তাওবা আসতাগফেরুল্লাহ। তুমি বলো কি দোস্ত? এই বয়সে ছেলে বিক্রি করে দোজখে যেতে বল?
–আলহামদুলিল্লাহ। জান, বর্তমান এই যান্ত্রিক সমাজের অধিকাংশ মানুষ বেহেশত-দোযখ এসব ভুলতে বসেছে। অর্থই এখন অনর্থের মাপকাঠি। মেয়ে পক্ষের নিকট থেকে যৌতুক নিবার প্রার্থী ওরাই। ওরাই এই প্রথা চালু করেছে। প্রকারান্তরে ওরা যে জাহান্নামের শিকল পায়ে পড়ছে সেটা ওরা বুঝতেই পারছেনা।
বুঝবে কি করে? ধর্মীয় বিধি-বিধানের চর্চাতো উঠেই গেছে। ধর্ম এখন আবদ্ধ হয়ে পড়েছে মসজিদ মাদরাসায়।
– সে মাদরাসাও তো ওরা তুলে দিতে চায়।
–তাতো চাইবেই। মাদরাসা তুলে দিতে পারলেই তো দেশ থেকে ধর্মকে বিদায় করা যাবে।
–তোমার কি ধারণা ওরা পারবে?
– প্রশ্নই ওঠেনা। শয়তান মানুষকে হয়রানি করতে পারে, ধর্মচ্যুতি ঘটিয়ে মানুষকে জাহান্নামে দাখিল করতে পারে, এই ক্ষমতাটুকু তাকে দেয়া হয়েছে মানুষের ঈমান পরীক্ষার জন্য, কিন্তু ইসলামের মৌলিক বিষয়ের উপর কর্তৃত্ব

করার ক্ষমতা তাকে দেয়া হয় নাই। ইসলাম পাঠিয়েছেন আল্লাহ, রক্ষাকর্তাও তিনিই। তবে সাময়িক মুসলমানদের উপর যে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে তা তাদেরই আমলের ফসল।
–হ্যাঁ, মুসলমানরা গাফেল হয়ে পড়বার কারণেই আজ তারা আল্লাহর মদদ পাচ্ছেনা।
–শুধুই কি গাফেল? মুসলমানরা ভাই ভাই বিক্ষিপ্ত অবস্থান নিবার কারণেই তারা আজ দুর্বল হয়ে পড়েছে। আর শয়তান সেই সুযোগটাই গ্রহণ করে চলেছে। এখনো যদি মুসলমানরা একতাবদ্ধ হতে পারে তাহলে শয়তানের গুষ্ঠি বাতাস ছাড়তে ছাড়তে পালাতে পথ পাবে না।
–এটাই এখন সময়ের দাবী। কিন্তু তা হচ্ছে কোথায়?
হবে, সে পদধ্বনী শোনা যাচ্ছে ইনশাল্লাহ, আল্লাহর তরফ থেকে ফায়সালা এসে যাবে। হ্যাঁ, দোস্ত আমি এখন যাব।
–এখনিই যাবে কি হে? এতদিন পর এলে, দুটো লবণ ভাত না খেয়েই যাবে?
–তোমার বাড়ীর লবণ অনেক খেয়েছি, আরো খাওয়ার আশা আছে। এখন তোমার মুখের স্বীকারোক্তিটা পেলেই আমি মহাখুশী মনে ফিরতে পারব।
–দেখ, বিয়ে-সাদী সম্পূর্ণ আল্লাহর ইচ্ছায় সম্পন্ন হয়ে থাকে। সেই আল্লাহর যদি ইচ্ছা থাকে– তাহলে আমি তোমাকে কথা দিলাম, মেয়ে তোমাকে দেব। তবে আমাকে দেড় মাস সময় দিতে হবে।
–আলহামদুলিল্লাহ। আজ আমি চিন্তামুক্ত হলাম। ঠিক আছে, তোমার সুবিধা মত সময়ই আমাকে জানিও। আজ তাহলে আমি উঠি!
– সত্যি এখন যাবে?
–হ্যাঁ, দোস্ত, অনেক কাজ পড়ে আছে।
–ঠিক আছে যাও, আমি ঠিক সময় মতই তোমাকে জানাব।
– খোদা হাফেজ।
–খোদা হাফেজ।
শরিফুল ইসলাম চলে যাবার পর খান বাহাদুর সাহেব ভাবলেন কথাটা এখনি স্ত্রীকে জানাবেন না। শাহিদার পরীক্ষার ফল বের হলে কথাটা বলবেন। তখন সকলেই চিন্তামুক্ত থাকবে। এখন বলতে গেলে হয়তো আবার ঐ একই অজুহাত তুলে বলবে পরীক্ষার ফল আগে বের হোক। তাই কথাটা তিনি নিজের মনেই গোপন রাখলেন।

[সাত]

সেদিন রকিব ঢাকার বাইরে যাবার কথা বাড়িতে বলে আসলেও সে বাইরে কোথাও যায়নি। বাড়ি থেকে বের হয়ে রকিব সোজা এসে ওঠে চেম্বারে। তার কিছুক্ষণ পরই পারভীন এসে রকিবকে চেম্বারে দেখে হাসতে হাসতে বলল, তুমি এসে পড়েছ, ভালই হলো, চলো বাড়িটা দেখে আসি। তা বাড়িতে কি বলে এসেছ?

তোমার শেখানো বুলি, ঢাকার বাইরে মামলা করতে যাচ্ছি। ফিরতে সপ্তাহ খানেক দেরি হবে। রকিবের কথা শুনে পারভীন হাসতে হাসতে বলল, আমিও তাই বলেছি। অন্ততঃ সাত দিনতো নিশ্চিন্তে থাকা যাবে। তারপর বিয়েটা ভালোয় ভালোয় হয়ে গেলে তখন আর চিন্তা নেই। পারভীনের কথার জবাবে রকিব বলল, আমার মনে হয় আমাদের বিয়েটা ঢাকার বাইরে কোথাও গিয়ে করলে বোধ হয় ভাল হত?

না-না, অপরিচিত জায়গায় এসব কাজ করতে গেলে লোকের সন্দেহের নজরে পড়লে ঝামেলা হতে পারে। তাছাড়া বিয়েতে সাক্ষীর দরকার আছে না? চলো বাড়িটা দেখে ঠিক করে রেখে আসি। বিয়ের পরেতো কোথাও উঠতে হবে।

- বাড়ির লোকেশান জান? রকিব জিজ্ঞাসা করে।

- হ্যাঁ, ঐ তো ইংলিশ রোডে। আমি সব লিখে রেখেছি। আমাদের কোর্ট থেকে কাছেই।

ঠিক আছে, চলো।

পারভীন উকিল বারে এসে এডভোকেট তোফাজ্জল হোসেনের সেরেস্তায় জুনিয়র হিসাবে জয়েন্ট করার পর থেকেই রকিবের উপর তার দৃষ্টি পড়ে। তবে সিনিয়রের সেরেস্তায় তেমন সুযোগ না থাকায় মনের কথা মনেই চেপে রাখতে হয়। হঠাৎ একদিন শুনতে পায় রকিব বিয়ে করছে। কিন্তু তখন বাঁধা দেবার কোন সুযোগ ছিল না। তাছাড়া রকিবের মনেও পারভীন সম্বন্ধে কোন কৌতূহল দানা বাঁধার সুযোগ পায় নাই। রকিবের বিয়ে হয়ে যায়। তারপর যখন পারভীন শুনতে পায় রকিব যে মেয়েকে বিয়ে করেছে সে মেয়ে খুবই রূপবতী এবং গুণবতী তবে পর্দানশীল। তখনি পারভীন মনে মনে ভাবে ঐ পয়েন্টেই রকিবকে ঘায়েল করতে হবে।

তখন থেকেই পারভীন ধীরে ধীরে নিজেকে প্রকাশ করতে থাকে রকিবের সামনে। এটাই বুঝি মেয়েদের ধর্ম! কোন পুরুষের উপর যদি কোন নারীর দৃষ্টি পড়ে ঐ পুরুষের পাশে অন্য নারীকে সে সহ্য করতে পারে না। প্রতিহিংসা তাকে ঠেলে দেয় ধ্বংসের দিকে। সুযোগ একদিন এসে যায় পারভীনের রকিবের সামনে নিজেকে উন্মুক্ত করে তুলে ধরার। রকিব পৃথক চেম্বার খুলে পৃথকভাবে প্রাক্টিস শুরু করে, পারভীন কৌশলে রকিবের চেম্বারে নিজের জায়গা করে নেয়। তারপর ধীরে ধীরে সে গ্রাস করতে থাকে রকিবকে। সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী শিক্ষিত পারভীনের মিষ্টি চটুল কথাবার্তা ও পুরুষ ভুলানো চাল-চলন রকিবকে আকৃষ্ট করতে থাকে। বিশেষ করে শামীমার সম্বন্ধে সেকেলে গেয়ো অপবাদের বিষোদগারে রকিবের মন স্ত্রীর উপর বিষাক্ত করে তোলে। একটি সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী যুবতী মেয়ের সংস্পর্শে যদি একটি যুবক পুরুষ প্রতিদিন দশ-বারো ঘন্টা কাটায় আর ঐ যুবতী যদি ইতিবাচক সাড়া দেয় তাহলে কোন মতেই ঐ পুরুষটি নিজেকে ধরে রাখতে পারে না, তাকে ধরা দিতেই হয় ঐ মায়াময়ীর মায়াজালে। রকিবের বেলায়ও তার ব্যতিক্রম হয়নি। পারভীনের ফাঁদে সে আটকা পড়ে যায়। আপনি থেকে তাদের সম্বোধন নেমে আসে তুমিতে। তারপর উভয়ে উভয়ের মাঝে লীন হয়ে যায়। ক্ষণিকের বিচ্ছেদও হয়ে ওঠে অসহ্য। শামীমাকে রকিবের কাছে মনে হয় আবর্জনা। মধুর প্রেম সম্ভাষণ বিষের মত মনে হয় রকিবের কাছে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নারী বলে মনে হয় পারভীনকে। শেষ পর্যন্ত তারা সিদ্ধান্ত নেয় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে এ বিচ্ছেদ ব্যথার অবসান ঘটাবে। কিন্তু পারভীন শর্ত আরোপ করে বসে রকিবের উপর। রকিবকে বলে, তুমি তোমার বৌকে তালাক দাও। রকিব চমকে ওঠে পারভীনের প্রস্তাবে। কিন্তু সরাসরি প্রত্যাখ্যানও করতে পারে না সে প্রস্তাব। সে বলে তালাকতো অবশ্যই তাকে দেব, তবে এখনই নয়। এখন তালাকের ঝামেলা করতে গেলে আমাদের বিয়েতে ব্যাঘাত ঘটবে। বিয়ের পরে ধীরে সুস্থে ওটা করা যাবে। পারভিন যুক্তি দেখায়, তালাক না দিলে তার অনুমতি ছাড়া বিয়ের অপরাধে যদি মামলা করে বসে তখন কি হবে? রকিব সান্ত্বনা দিয়ে বলে মামলা সে কোন দিনই করবে না। সেদিক দিয়ে তুমি নিশ্চিন্তে থাকতে পার। এবার রকিব পাল্টা প্রশ্ন করে পারভীনকে। রকিব বলে, তোমার বাপ-মায়ের অমতে বিয়ে করায় তারা যদি কেস করে? পারভীন হেসে জবাব দেয়, আমাদের পরিবারের ছেলে-মেয়েদের ব্যক্তি স্বাধীনতা জন্মগত অধিকার। তাছাড়া আমি শুধু এডাল্টই নই একজন আইনজীবিও। আমি আমার

পিতা-মাতাকে বলেই তোমাকে বিয়ে করতাম, তাতে তাদের কোনই আপত্তি থাকত না, কিন্তু আমার পিতা তার মেয়েকে সতীনের উপর এবং চুপে চুপে বিয়ে দিতে রাজী হবেন না। কারণ তিনি একটা সমাজ ও সামাজিকতা নিয়ে বাস করেন। আবার ঢাক-ঢোল পিটিয়ে এ বিয়ে সম্ভব নয়, তোমার তরফ থেকে বিরাট বাধা আসবে। তাই বিয়ের পর কিছুদিন আত্মগোপন করে থাকতে হবে।

কিন্তু সেই আত্মগোপন করার জায়গা কোথায়? রকিব জিজ্ঞাসা করে?

আপাতত আশেপাশে বাড়ি ভাড়া নিয়ে সেখানেই উঠতে হবে, তুমি মুহুরী সাহেবকে বলো একটা বাড়ি দেখতে। এরপরের ঘটনা সকলেরই জানা আছে। ওরা বাড়ি দেখতে গিয়ে বাড়ি পছন্দ হলে অগ্রীম দিয়ে একেবারে ঘরে তালা লাগিয়ে চলে এল। সিদ্ধান্ত হলো আজই সন্ধ্যায় দু'জন বন্ধুকে সাথে নিয়ে কাজি অফিসে যাবে এবং বিয়ে রেজিস্ট্রী করে বাসায় ফিরবে। ঘরে ওরা দেখে এসেছে দু'খানা চৌকি পাতা আছে। তাই রাত কাটাবার জন্য মুহুরী সাহেবকে একটি তোষক, দু'টি বালিশ ও একখানা চাঁদর কিনে রাখতে টাকা দিয়ে উভয়ে কোর্টে চলে গেল। বিকালে কোর্ট থেকে দু'জন এডভোকেট বন্ধুকে সাথে নিয়ে ওরা কাজী অফিসে গেল এবং এক লাখ একশত একটাকা মহরানা ধার্য করে যথাবিহীত বিবাহ কার্য সম্পাদন করে সকলে গিয়ে চাইনিজ রেষ্টুরেন্টে ঢুকল। পরদিন থেকে পারভিন মনোযোগ দিল সংসার গুছাতে। সংসারের টুকিটাকি জিনিসপত্র কেনা-কাটার পর একজন কাজের মেয়ের সে যোগাড় করে ফেলল। নতুন দম্পতির নতুন সংসার মধুর আমেজে কাটতে লাগলো। উভয়ের পরিবারের কেউ জানতে পারল না, তাদের সন্তানেরা জীবনের এক নব অধ্যায় রচনা করে সুখের সাগরে অবগাহন করছে, জানলো না এক স্বামী সোহাগী গৃহবধূ তার জীবনের সব সুখ-শান্তি এক অশুভ রাহুর কবলে পড়ে অনিশ্চিত হতে চলেছে। দেখতে দেখতে সপ্তাহ কেটে গেল। কিন্তু রকিব ফিরে আসছে না দেখে শামীমা চিন্তিত হয়ে পড়ল। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে দোয়া করতে লাগল স্বামীর মঙ্গলের জন্য। স্বামী যাতে ভালভাবে ফিরে আসে তার জন্য কান্নাকাটি করতে লাগল আল্লাহর দরবারে দুই হাত তুলে। কেটে গেল আরো দু'টি দিন। কিন্তু তবু রকিব ফিরল না দেখে বাড়ির সকলেই চিন্তিত হয়ে পড়ল। শাহিনা বেগম শামীমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, মামলা- মোকদ্দমার ব্যাপার, হয়তো কোন কারণে দেরি হচ্ছে, তার জন্য অত চিন্তার কি আছে মা? এসে যাবে দু-একদিনের মধ্যেই। কিন্তু শামীমার অন্তর এ সান্ত্বনায় প্রবোধ মানতে চায় না। সে বলে, মা আমার মন বলছে নিশ্চয়ই কিছু ঘটেছে। আপনি

হাসান ভাইকে পাঠান, তিনি কোর্টে গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসুন।

ঠিক আছে মা। আমি কালই হাসানকে পাঠাব। তারপর রাতে খান বাহাদুর সাহেবকেও কথাটা বললেন, শাহিনা বেগম। শুনে তিনিও ভাবনায় পড়লেন, বললেন কাল সকালেই হাসানকে পাঠাও। দিন কাল ভালনা। বাড়ি থেকে বের হলেই যেখানে ফিরে আসার নিশ্চিয়তা থাকে না। সেখানে দশ-বার দিন হয়ে গেল একটি ছেলের কোন খোঁজ নেই। যেখানেই থাক টেলিফোন করেও তো খবরটা জানানো উচিত ছিল তার। রকিব ঢাকার বাইরে কোথায় গেছে তা কিছু বলে যায়নি?

- হ্যাঁ, বলেছে দিনাজপুর যাচ্ছি। বললেন শাহিনা বেগম।

ঠিক আছে তুমি হাসানকে কাল কোর্টে পাঠাও। দরকার হলে দিনাজপুরে লোক পাঠাতে হবে। পরের দিন মেহেদী হাসান কোর্টে গিয়ে যখন পৌঁছল তখন বেলা ৯টা। তখনো কোর্ট পুরা খোলেনি। বার লাইব্রেরীতে গিয়ে কেরানী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারল, রকিব গতকালও কোর্টে এসেছিল। হাসান সংবাদ শুনে কিছুটা আশ্বস্ত হলো বটে; কিন্তু এই সংবাদের মধ্যে কেমন যেন একটা রহস্যের গন্ধ পেল। সে কেরানী সাহেবের নিকট থেকে রকিবের চেম্বারের ঠিকানা নিয়ে রওনা হলো। চেম্বারে তখন কেউ ছিল না। শুধু মুহুরী সাহেব সেরেস্তায় বসে মামলার কাগজপত্র ঠিক করছিলেন। হাসান গাড়ী থেকে নেমে সেরেস্তার বারান্দায় উঠতেই মুহুরী সাহেব নতুন মক্কেল এসেছে ভেবে তাড়াতাড়ি বের হয়ে এসে বললেন, আসুন স্যার, আসুন, বসুন। কি মামলা স্যার? ফৌজদারী না আদালত? আমাদের এডভোকেট সাহেব স্যার দুটোতেই পারদর্শী। মুহুরী সাহেবের কথা শেষ হলে হাসান জিজ্ঞাসা করল, আপনার এডভোকেট সাহেবের নাম কি রকিব আহমেদ?

জ্বী স্যার, খুব নাম করা এডভোকেট,আমি তার মুহুরী, স্যার।

তিনি কোথায়?

এই কিছুক্ষণ আগে বাসায় গেছেন।

- বাসায়! বাসা কোথায়?

- ঐ তো ইংলিশ রোডে স্যার। তবে তিনি বাসায় মামলা দেখেন না। আপনি কাগজপত্র আমাকে দিন, আমি সব ঠিক করে সাহেবকে বুঝিয়ে দেব।

মুহুরী সাহেবের কথায় হাসানের সন্দেহ আরো ঘনিভূত হতে থাকে। সে ভাবতে লাগল, এই রকিব আহমেদই কি খান বাহাদুরের ছেলে রকিব আহমেদ? সে ভুল করেনি তো? রকিব আহমেদ নামে আরো এডভোকেট থাকতে পারে। সে

আরো পরিষ্কার হবার জন্য মুহুরী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা মুহুরী সাহেব, এডভোকেট সাহেব কি কোন ম্যাচে থাকেন?

না স্যার, ম্যাচে থাকবে কেন? চার হাজার টাকা ভাড়ায় বাসা ঠিক করে দিয়েছি।

তা ঐ বাসায় আর কে থাকেন?

সাহেব আর মেম সাহেব, মেম সাহেবও এডভোকেট।

এবার হাসান ভাবে, সে ভুল করেছে। কারণ মুহুরী সাহেবের কথার সাথে সে কিছুতেই রকিবকে মিলাতে পারছেনা। তাই আবার কায়দা করে জিজ্ঞাসা করল, আমি তো শুনেছিলাম রকিব সাহেব বিবাহ করেন নাই। তা কবে বিয়ে করলেন?

- বেশী দিন হয় নাই। এই দশ-বার দিন হবে।

হাসান আবার চমকে ওঠে। এখানে তো আবার অংকে মিলে যাচ্ছে। রকিবও তো দশ-বার দিন আগেই বাড়ি থেকে চলে এসেছে। তাহলে কি রকিব- না-না, তাইবা হয় কি করে, বাড়িতে অত সুন্দরী বৌ থাকতে রকিব আবার বিয়ে করবে, তাওকি সম্ভব? হাসান ভাবল মুহুরী সাহেবের কাছ থেকে বাসার ঠিকানা নিয়ে বাসায় যাবে, তাহলেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। সে মুহুরী সাহেবের কাছে বাসার ঠিকানা চাইল। কিন্তু মুহুরী সাহেব জবাবে বলল, না স্যার, বাসার ঠিকানা দিতে পারব না। বাসায় যাওয়া নিষেধ আছে। আপনি আমাকে কাগজপত্র দেন। হাসান এবার ঘটনার সত্যতা উপলব্ধি করতে পারল। সে এখন পরিষ্কার বুঝতে পারল নিজেকে গোপন রাখার জন্যই এই ব্যবস্থা। সে মুহুরী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করল, সাহেব কি কোর্টে যাবার পূর্বে এখানে আসবেন?

-হ্যাঁ, আসবেন, অপেক্ষা করুন?

হাসান ভাবতে লাগল সে এখন কি করবে? যদি এখানে সে অপেক্ষা করে আর সত্যি যদি বৌকে সাথে নিয়ে রকিব হাজির হয় তাহলে সামনা সামনি যে দৃশ্যের অবতারণা হবে তা কারোর জন্যই সুখকর হবে না, উভয়ের জন্যই হবে লজ্জাজনক। সে চিন্তা করল তারচেয়ে দূরে কোথাও অপেক্ষা করে বিষয়টা অবলোকন করাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। হাসান মুহুরী সাহেবকে বলল, আমি ঘুরে আসছি, ততক্ষণ সাহেব আসুন। বলেই সে গাড়ীতে উঠে গাড়ী স্টার্ট দিল। রকিবের চেম্বার থেকে ইংলিশ রোডে যেতে রাস্তার মোড়ে উল্টা দিকে হাসান গাড়ী থামিয়ে গাড়ীর ভিতরেই বসে রইল পথের দিকে দৃষ্টি মেলে। বেশীক্ষণ

অপেক্ষা করতে হলো না। হাসান দেখতে পেল একটি রিক্সায় রকিব ও তার পাশে কালো কোর্ট গায়ে একটি সুন্দরী মেয়ে বসে আছে এবং তারা সোজা চেম্বারের দিকে চলে গেল। হাসানের কাছে এবার সব পরিষ্কার হয়ে উঠল। বৌকে আধুনিকা বানাতে না পেরে সে এই অত্যাধুনিকা সুন্দরীকে বিয়ে করে বৌয়ের উপর প্রতিশোধ নিয়েছে। যুগের দাবীর কাছে মাথা নত করে যুগ যুগ থেকে ধরে রাখা বংশের ঐতিহ্য সে এভাবেই ধুলায় মিশিয়ে দিয়েছে। হাসানের আর প্রবৃত্তি হলোনা ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে। সে গাড়ীর মুখ ঘুরিয়ে ফিরে চলল পল্লবীর দিকে। হাসান গাড়ীতে বসে একটা কথাই শুধু ভাবতে লাগল, এই নিদারুণ সংবাদ শামীমাকে সে কিভাবে জানাবে। বাসায় ঢোকার সাথে সাথে যখন একে একে সকলে এসে ঘিরে ধরবে সংবাদ শুনার জন্য তখন এই সংবাদ সে কিভাবে পরিবেশন করবে? এই সংবাদ শোনার পর একটি নিষ্পাপ কঁচিমনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে তার পরিণতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? এ ছাড়াও রকিবের ভবিষ্যতই বা কি? আজ যে মোহ তাকে অন্ধ করে বাপ-মা ও স্ত্রী থেকে দূরে সরিয়ে এনেছে সে মোহ যখন কেটে যাবে তখন তার পিতার সহানুভূতি সে কতটুকু পাবে অথবা মোটেও পাবে কি না? তিনি যে রাগী লোক, তাতে ব্যাপারটি তিনি কিভাবে নেবেন সেটাও চিন্তার বিষয়। হাসান মনে মনে সিদ্ধান্ত নিল বাসায় ঢুকে সোজা খালাম্মার সাথে দেখা করে তাকেই কথাটা সে বলবে। তারপর খালাম্মা কাকে কিভাবে বলবেন তিনিই তার সিদ্ধান্ত নেবেন। এইরূপ চিন্তা-ভাবনা করে হাসান বাসায় ঢুকে সোজা শাহিনা বেগমের ঘরে গিয়ে ঢুকল। শাহিনা বেগম হাসানের আগমন প্রতিক্ষায় প্রহর গুণছিলেন। হাসানকে দেখেই তিনি উদ্বিগ্নের সাথে স্বপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন। এদিকে শামীমা রান্না ঘর থেকে হাসানকে শাশুড়ির ঘরে ঢুকতে দেখে সেও এসে বাইরে দরজার পাশে দাঁড়াল। হাসান প্রথমে বলল, রকিব ভাল আছে এবং সুস্থ্য আছে। শাহিনা বেগম আল্‌হামদুলিল্লাহ বলে আল্লাহর শুকুর আদায় করলেন। তারপর হাসান বিস্তারিত ঘটনা খুলে বলে। শাহিনা বেগম দম বন্ধ করে সব শুনতে থাকেন এবং ধীরে ধীরে তার চেহারা মলিন আকার ধারণ করে। তিনি কিছুতেই চোখের পানি আটকাতে পারলেন না, দুই চোখের পানিতে তার শাড়ির আঁচল ভিজে ওঠে। হাসানের বলা শেষ হলে তিনি ঢুকরে কেঁদে উঠে বলেন, আমি শামীমাকে কি বলে প্রবোধ দেব? হাসানেরও চোখে পানি এসে যায়। সে আর অপেক্ষা না করে ঘর থেকে বের হয়ে চলে যায়, শামীমা এসে ঘরে ঢোকে। শাহিনা বেগম শামীমাকে দেখে

তাকে জড়িয়ে ধরে আরো জোরে কাঁদতে থাকেন। তা শুনে পাশের ঘর থেকে শাহিদা ছুটে এসে জিজ্ঞাসা করে– কি হয়েছে মা, তোমরা কাঁদছ কেন? শাহিনা বেগম কিছু বলার আগেই শামীমা শাহিনা বেগমের বুক থেকে মাথা তুলে আঁচলে তার চোখের পানি মুছে দিয়ে বলে, আপনি কাঁদবেন না মা, আমি সব শুনেছি।

তুই সব শুনেছিস? বলেই তিনি আবার কেঁদে উঠলেন। শামীমা বলল, হ্যাঁ আমি বাইরে দাঁড়িয়ে সব শুনেছি। আপনি কাঁদবেন না। শামীমার কণ্ঠও ভারি হয়ে এলো। শাহিনা বেগম কান্না জড়িত কণ্ঠে বললেন, তোর মত সোনার প্রতিমার এতবড় সর্বনাশ যে করতে- শামীমা শাহিনা বেগমের মুখ চেপে ধরে বলল, আমার জন্য চিন্তা করবেন না মা, ইনশাআল্লাহ আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন। হয়তো আমারই কোন পাপের ফলে- ওরে না-না, ওকথা বলিসনা, তোর মত মেয়ে পাপ করতে পারে না। এবার শামীমা আর নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। শাহিনা বেগমের বুকে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। শাহিদা এসব কথার কিছুই বুঝতে না পেরে বলে ওঠে, কি হয়েছে মা? তোমরা এভাবে কাঁদাকাটি করছ কেন? ভাইজানের কি কোন খারাপ সংবাদ পেয়েছ? শাহিদার প্রশ্নের জবাবে শাহিনা বেগম বললেন, ঐ কুলাংগারকে আর ভাইজান বলবিনা, ও এ বাড়ির কেউ না, আমার ছেলে না। তিনি আবার ফুপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। শামীমা মাথা তুলে শাহিদার দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার ভাইজান আবার বিয়ে করেছেন, শাহিদা।

বিয়ে! ভাইজান আবার বিয়ে করেছেন? কি বলছ তোমরা?

হ্যাঁ, হাসান ভাইজান দেখে এসেছেন। মুহূর্তে শাহিদার মুখের কথা ফুরিয়ে গেল। শামীমার মুখের দিকে তাকিয়ে শাহিদার দু'টি চোখও অশ্রুতে ভরে উঠল। এমন সময় খান বাহাদুরের গলা শুনে শামীমা ও শাহিদা ঘর থেকে বের হয়ে রান্না ঘরের দিকে চলে গেল। খান বাহাদুর সোজা এসে ঢোকেন স্ত্রীর ঘরে। ঘরে ঢুকে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে তিনি চমকে ওঠেন। জিজ্ঞাসা করেন তুমি কাঁদছ কেন? শাহিনা বেগম স্বামীকে দেখে আঁচলে চোখ মুছে বলেন, বস। খান বাহাদুর সাহেব স্ত্রীর বিছানায় বসেন। তারপর স্ত্রীর মুখে ছেলের সব কথা তিনি মনোযোগ দিয়ে শোনেন। শুনে অনেকক্ষণ কোন কথা না বলে চুপ করে বসে থাকেন। তারপর একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে বলেন, এর চেয়ে ওর মৃত্যু সংবাদ আমার কাছে শ্রেয় ছিল। আমার দুঃখ ওর জন্য নয়, দুঃখ বৌমার জন্য। মেয়েটাকে আমি কি বলে সান্ত্বনা দেব আর কোন মুখেই বা ওর সামনে দাঁড়াব!

একি আল্লাহর পরীক্ষা, না কোন পাপের প্রতিফল বুঝতে পারছি না। তিনি আর কিছু না বলে ঘর থেকে বের হয়ে নিজের ঘরে চলে গেলেন। মুহূর্তে সমস্ত বাড়িটা এক মৃতপুরিতে পরিণত হয়ে পড়ল। মেঘমুক্ত নির্মল আকাশটা হঠাৎ কালো মেঘে ছেয়ে গেল। একটা কাল বৈশাখীর আশংকায় সকলেই শংকিত হয়ে উঠল। একইভাবে কেটে গেল দু'টি দিন। নীরব কান্নায় শামীমার দু'টি আঁখি রক্ত জবার রূপ ধারণ করল। একই সাথে আরো দু'টি হৃদয়ে বিষাদের ছায়া দেখা দিল। অলক্ষ্যে থেকেও খান বাহাদুর সাহেব সব বুঝতে পারলেন। তিনি স্ত্রীর ঘরে এসে বসলেন। ডাকলেন শামীমাকেও। জিজ্ঞাসা করলেন কি প্রতিকার সে চায়? জবাবে শামীমা বলল, এরতো কোন প্রতিকার নেই আব্বা।

নিশ্চয়ই আছে। প্রথম স্ত্রীর বিনা অনুমতিতে দ্বিতীয় বিয়ে করা দন্ডনীয় অপরাধ।

- সে দন্ডতো নিজের উপর এসেই পড়বে, আব্বা! এতে যে দুঃখ আরো বেড়ে যাবে। তার চেয়ে তক্‌দিরের লিখন মেনে নিয়ে চুপ থাকাই কি ভাল নয়?

অসম্ভব! তুমি ক্ষমা করলেও আমি ওকে ক্ষমা করব না। তিনি স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি হাসানকে পাঠিয়ে স্ট্যাম্প আনিয়ে রাখবে, আমি ওকে ত্যাজ্যপুত্র করে সমস্ত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করব।

আপনি অত উতলা হবেন না, আব্বা। এখনি কিছু করা ঠিক হবে না। তাছাড়া লঘু পাপে গুরুদন্ড দেয়াও উচিত হবে না।

- লঘু পাপ! একে তুমি লঘু পাপ বলছ?

হ্যাঁ আব্বা! সেত অবৈধ এমন কোন কাজ করে বসেনি যার কারণে বংশ মর্যাদা বা মান-সম্মানের উপর আঘাত আসতে পারে। শরীয়ত সম্মতভাবে বিয়ে করেছে। আর মুসলমানদের জন্য একাধিক বিয়ে তো শরীয়তেই জায়েজ আছে আব্বা।

এ তুমি কি বলছ বৌমা? এত বড় অন্যায়ের পরেও তুমি একথা বলতে পারলে?

আব্বা, বিচিত্র মানুষের মন। আমি তার মনের চাহিদা মেটাতে পারিনি। এ দোষতো আমার। আমি যেমন তার কথা মেনে নিতে পারিনি, তেমনি সেও হয়তো আমার আচরণ মেনে নিতে পারেনি। তাই মনের তাগিদেই এ কাজ করে থাকবে।

শামীমা, এগুলো কি তোর মনের কথা? জিজ্ঞাসা করেন শাহিনা বেগম।

- হ্যাঁ মা, আমি জানি শয়তান তাকে সাময়িক ভাবে বিভ্রান্ত করলেও ভুল তার

ভাঙবে। ফিরে সে আসবেই। আমি সেদিনের অপেক্ষায় থাকব, মা।

তাই যেন হয় মা, তোর কথাই যেন সত্য হয়।

শামীমার কথায় খান বাহাদুর সাহেব শুধু অবাকই হলেন না বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লেন। তিনি আবেগে আপ্লুত হয়ে বললেন, তোমার মনোবল আজ আমাকেও হার মানিয়েছে মা। আমি দোয়া করি মুসলমানদের ঘরে ঘরে তোমার মত মেয়ের জন্ম হোক।

- আব্বা, আপনারা শুধু দোয়া করবেন আল্লাহ যেন আমাকে ধৈর্য ধারণ করার ক্ষমতা দান করেন।

হ্যাঁ মা, দোয়া করব, নিশ্চয়ই দোয়া করব। তুমি আজ আমাকে চিন্তামুক্ত করলে মা। আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে থাকেন। অবশ্যই তিনি তোমাকে মদদ করবেন।

[আট]

এক মাস পরের কথা। শাহিদা প্রথম শ্রেণীতে বি.এ পাস করেছে। বাড়ির সবাই ধীরে ধীরে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলেও শামীমা স্বাভাবিক হতে পারছেনা। স্বামীর বিরহে তার দেহমন দিন দিন ভেঙে পড়ছে। বাইরে সেই বিরহের ব্যথা প্রকাশ না করে চেপে রাখতে চাইলেও শাহিনা বেগমের চোখে সবই ধরা পড়ছে। রকিবের বিয়ের খবর প্রচার হবার পর খুলনা থেকে শাহিদার বড় বোন শরিফা এসে শামীমাকে খুলনায় তার বাসায় নিয়ে যাবার জন্য অনেক পীড়াপীড়ি করেছে, কিন্তু শামীমা কিছুতেই যেতে রাজি হয় নাই। শামীমার মা এর মধ্যে দুইবার এসেছেন। কিন্তু তিনিও মেয়েকে নিয়ে যেতে ব্যর্থ হয়েছেন। স্বামীর ঘর ছেড়ে সে কোথায়ও যেতে রাজি না। শাহিনা বেগম শামীমার সব দুঃখই বুঝতে পারছেন। কিন্তু করতে পারছেন না কিছুই। আর কিইবা করতে পারেন তিনি। মুখের সান্ত্বনা ছাড়া কিইবা করার আছে তার? তিনি ভাবলেন, শামীমাকে যদি তার মায়ের কাছে কিছু দিনের জন্য পাঠান যায় তাহলে ওর মনটা হয়তো কিছুটা ভাল হতে পারে। তাই একদিন তিনি শামীমাকে বললেন, শামীমা তোর মা দুইবার এসে ফিরে গেছেন, তুই না হয় তোর মার কাছে গিয়ে কিছু দিন থেকে আয় মা। অনেক দিন থেকেই তো যাসনা। কিছু দিন মার

কাছে থাকলে দেহ-মন দু'টোই ভাল হবে। শাহিনা বেগমের কথায় শামীমা বলল, না মা, আপনাকে এ অবস্থায় রেখে আমি কোথাও গিয়ে শান্তি পাবো না।

- কিন্তু মা, তোর মুখের দিকে যে তাকান যায়না। আয়নায় চেহারাটা দেখেছিস, কি হয়েছে শরীরটা?

আপনি শুধু আমার চেহারাটাই দেখছেন, নিজের চেহারার দিকে লক্ষ্য করেছেন? আপনার চেহারাও কি আগের মত আছে?

- আমার কথা ছেড়ে দে, আমার জীবনের তো শেষ। আর তোর জীবন শুরুই হলোনা।

- মানুষ যেখানে পড়ে সেখান থেকেই তো ওঠে মা, আল্লাহর বিধানই যে তাই। আল্লাহ তাঁর বান্দা-বান্দীদের দুনিয়ায় এত নিয়ামত দান করে প্রতিপালন করছেন। বিনিময়ে তিনি এই সামান্য ধৈর্যের পরীক্ষাও নেবেন না তা কি করে হয় মা? আমার আব্বা বলতেন আল্লাহ যাকে যত বেশী ভালবাসেন তার উপর ততবেশী মুসিবত দিয়ে পরীক্ষা করেন।

- শামীমা, আমি তোর মা, না তুই আমার মা? এত কথা তুই কোথায় শিখলি?

- দুটোই। আপনি আমার মা, আমি আপনার মা। আর কথা তো শিখতে হয়না মা, মানুষের বিবেক কথা বলে।

বিবেক তো সব মানুষেরই আছে। কিন্তু কয়টি মেয়ের মুখ থেকে এসব কথা বের হয়? তোকে দিয়ে যদি দুনিয়াটা বিচার করা যেত তাহলে জান্নাতের সুখ মানুষ দুনিয়াতেই ভোগ করত। আল্লাহ তোর সব দুঃখের অবসান করুক, তোর মত মেয়ের মা হওয়া যে কত বড় ভাগ্যের কথা।

আপনার মত মায়ের মেয়ে হওয়া বুঝি কম ভাগ্যের কথা? শাহিনা বেগম শামীমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, আমার মাথায় যত চুল আল্লাহ তোকে তত হায়াত দান করুক।

এতদিন রকিবের ব্যাপারে অশান্তির মধ্যে থাকায় শরিফুল ইসলামের কথা খান বাহাদুরের ভাববার অবকাশ হয় নাই। আজ হঠাৎ কথাটা মনে পড়ে যাওয়ায় তিনি ছুটে যান স্ত্রীর কাছে। কারণ খান বাহাদুরের তরফ থেকেই বিয়ের তারিখ ঠিক করে পাঠাবার কথা ছিল। শাহিনা বেগম তখনো শামীমার সাথে কথা বলছিলেন। খান বাহাদুর সাহেব দু'জনকে একত্রে দেখে হেসে বলে উঠলেন, এই যে, মা-মেয়ে মিলে আমার বিরুদ্ধে কি সব ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে? খান বাহাদুরের কথার জবাবে শামীমা বলল, বারে যার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, ষড়যন্ত্রের

কথা তাকে বুঝি কেউ বলে?

নাও, জবাব দাও। স্বামীর উদ্দেশ্যে বললেন শাহিনা বেগম।

লা- জবাব। বেটি আমার ব্যারিষ্টার হলে পসার জমাতে পারত। হ্যাঁ শোন, আমার সেই বাল্য বন্ধু শরিফুল ইসলাম যার কথা আগেও তোমাকে বলেছিলাম। মাঝে সে আমার কাছে একবার এসেছিল, আমি তাকে কথা দিয়েছি তার ছেলের সাথেই শাহিদার বিয়ে দেব। বাকি শুধু দিন-তারিখ ঠিক করা, আর সে দায়িত্বও আমার। আমার সুবিধা মত তারিখ জানাতে বলে গেছে সে। এখন তোমরা মা-মেয়ে একটি তারিখ ঠিক করে আমাকে বলো। আমি সেভাবেই তাকে জানিয়ে দেব।

খান বাহাদুর সাহেব কথাগুলো বলে থামলেন। শাহিনা বেগম জিজ্ঞাসা করলেন, একেবারে পাকা কথা দিয়ে ফেলেছ?

তাহলে আর বললাম কি? শুধু দিন ধার্য করা বাকি।

- কিন্তু আব্বা, পাকা কথা দিবার আগে শাহিদার মতটা নেয়া দরকার ছিল না কি? বলল, শামীমা।

- দেখ মা ছেলে ভাল, বিষয়-সম্পদশালী পরিবার, তার উপর ছেলে অনেক দিন বিলেতে ছিল, শিক্ষা-দীক্ষাও কম নয়, সেখানে শাহিদার অমত থাকবে কেন?

- শুধু শিক্ষা-দীক্ষা আর সম্পদই তো সুখ-শান্তির মাপকাঠি নয় আব্বা। শাহিদা বড় হয়েছে ডিগ্রী পাস করেছে, তার মতামতের কি এখানে দরকার ছিল না?

হয়তো ছিল। তবে তা যখন নেয়া হয়নি তখন তা নিয়ে আলাপ করে লাভ নেই। কথা যখন দেয়া হয়ে গেছে তখন বিয়েও সেখানেই হবে। তোমরা শাহিদাকে বলে দিনটা আমাকে জানাবা।

কিন্তু যদি মেয়ে রাজি না হয়? প্রশ্ন করলেন শাহিনা বেগম।

আমি আশা করব তার পিতার সম্মান রক্ষা করতে সে অমত করবেনা। খান বাহাদুর সাহেব আর কথা না বাড়িয়ে চলে গেলেন। শাহিনা বেগম ও শামীমা উভয়েই কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর শাহিনা বেগম শামীমাকে বললেন, তুই কথাটা শাহিদাকে বলিস মা।

শাহিদা এ বিয়েতে রাজি হবে না।

রাজি হবে না! তুই কিভাবে জানলি?

আমি জানি, সে কিছুতেই এ বিয়েতে রাজি হবে না। তাছাড়া বিলেত ফেরত ছেলের সাথে শাহিদার মত মেয়ে সংসার করতে পারবে না, শেষে আমারই মত পরিণতি ঘটবে। শামীমার শেষের কথায় শাহিনা বেগম শিউরে উঠলেন।

বললেন, কিন্তু উপায়? তোর আব্বা যে কথা দিয়ে ফেলেছেন।

কথা দিলেও দিন-তারিখ তো এখনো ঠিক হয় নাই। আব্বা ইচ্ছা করলে এ বিয়ে ঠেকানো সম্ভব।

আমার মনে হচ্ছে তুই যেন আমার কাছে কিছু লুকাচ্ছিস। সত্যি করে বলত মা, শাহিদা তোকে কিছু বলেছে নাকি?

- আপনি মা, আপনার কাছে লুকিয়ে কোন কিছু করাই সম্ভব নয়। আমি যেটুকু বুঝতে পেরেছি তাতে মনে হয় শাহিদা হাসান ভাইজানের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছে।

- বলিস কি?

হ্যাঁ, তাই মনে হয়। আর আমার দৃষ্টিতে হাসান ভাইজানই শাহিদার জন্য উপযুক্ত পাত্র। এ যুগে এমন নির্ভেজাল পাত্র পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। শামীমার কথা শুনে শাহিনা বেগমের চিন্তার মোড় ঘুরে গেল। তিনি ভাবতে লাগলেন, আশ্চর্য ব্যাপার। হাসান এতদিন থেকে এ বাড়িতে আছে অথচ তারা কোন দিনই বিষয়টির কথা চিন্তা করে নাই। হাসানের মত এমন কর্মঠ ছেলে সত্যি দুর্লভ। শামীমা ঠিকই বলেছে, হাসানই শাহিদার জন্য উপযুক্ত পাত্র। এজন্যই কথায় বলে অন্ধরা আল্লাহকে ঘরে রেখে জঙ্গলে খুঁজে মরে। কিন্তু এখনতো আফসোস করে লাভ নেই। তার স্বামীকেও তিনি জানেন। কথা দিলে কোন কিছুর বিনিময়েই কথা ফেরাবেন না। শাহিনা বেগমকে চিন্তিত দেখে শামীমা জিজ্ঞাসা করল, কি ভাবছেন মা?

আমি আর একটি -অশনি সংকেত শুনতে পাচ্ছি মা। তোরা আগে কেন একথা আমাকে বলিসনি?

- সে সুযোগই তো আসেনি। তাছাড়া আব্বা হঠাৎ এভাবে কথা দিবেন তাইবা কে জানত? আপনি আব্বাকে এখনি কিছু বলবেন না। বললে ব্যাপারটা আরো জটিল হয়ে পড়বে।

তুই কি করতে চাস?

- আমি আর একবার আব্বাকে বুঝাতে চেষ্টা করব।

- কোন ফল হবে না মা, তিনি ভাঙবেন তবু মচকাবেন না।

মা, শুনেছি আল্লাহ জোড়া ঠিক করেই মানুষ পাঠিয়েছেন দুনিয়ায়। তাই যদি হয় তাহলে আল্লাহর বিধান লংঘন করার ক্ষমতা তো মানুষের নেই। আমরা কেন অত ভেবে মরছি? যাঁর ভাবনা তিনিই ভাববেন। আমরা চেষ্টা করার মালিক, চেষ্টা করব।

তুই কি একথা তাকে বুঝাতে পারবি? আর শাহিদাই কি তোর নীতিবাক্য মেনে নেবে? ও যে পথে পা বাড়িয়েছে সে পথ যে বড় কঠিন পথ মা। মানবিক সব ব্যাখ্যা সেখানে অচল। কোন নীতি কথাই যেখানে কাজ করে না। ঐ জগতটা সম্পূর্ণ আলাদা। ঐ পথে যারা পা বাড়ায় তাদের ফেরানো যায় না। তবু চেষ্টা করে দেখ, আমি আর ভাবতে পারছি না।

আপনি দুঃশ্চিন্তা করে শরীর খারাপ করবেন না, আপনি শুধু সেই মহান দরবারে দোয়া করতে থাকুন, তিনি যেন সব বিপদ থেকে রক্ষা করেন।

তখনকার মত আলোচনা বন্ধ করে যে যার কাজে চলে গেল। রাতে খাওয়া-দাওয়া শেষে যখন শুতে গেল তখন শামীমা ভাবতে লাগল কিভাবে সে কথাটা শাহিদার কাছে তুলে ধরবে। রকিবের দ্বিতীয় বিয়ের খবর শোনার পর শাহিদা শামীমার প্রতি খুবই সহানুভূতিশীল। আগের মত আর হাসি-তামাসা করে না। প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া আজেবাজে কথাও বেশী বলে না। শামীমা বিছানায় শুয়ে শাহিদাকে উদ্দেশ্য করে বলল, আচ্ছা শাহিদা, তুমি আমাকে প্রায়ই বলে থাক– কপালের লিখন খন্ডানো যায় না, তোমার জন্ম লগ্নেই আল্লাহপাক তোমার কপালে সতীনের দুর্ভোগ লিখে রেখেছিলেন?

- হ্যাঁ, বলেছি। তুমি কি তক্‌দীরে বিশ্বাস কর না?

না-না, তা করব না কেন? বিশ্বাস করি এ জন্যই তো তক্‌দীরকে মেনে নিয়েছি। আমার প্রশ্ন হলো তুমি তক্‌দীরের উপর কতটা বিশ্বাসী?

তুমি হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন করছ ভাবী?

- আমার কথার আগে জবাব দাও।

এটা কি কোন প্রশ্ন হলো? তক্‌দীর যে বিশ্বাস করে না সে তো মুসলমানই না।

হ্যাঁ, তুমি ঠিক বলেছ। আচ্ছা ধর, হাসান ভাইজানের সাথে মিলন তোমার বিধিলিপিতে লেখা নেই, সেখানে অন্য কারো নাম লেখা আছে। অথচ তোমার মনপ্রাণ চায় হাসান ভাইজানকে, এখন তুমি কি করবে? শামীমার কথা শুনে সজাগ হয়ে বিছানায় উঠে বসে শাহিদা বলে, ভাবী এ প্রশ্ন করার অর্থ কি?

- প্রশ্নের জবাব পেলে বলব।

- দেখ, তক্‌দীর যেমন সত্য বিধির বিধান তেমনি মানুষের চালিকা শক্তিও সেই সুপ্রিম পাওয়ারে। তার ইংগীতেই মানুষ চলাফেরা করে।

শয়তানও কিন্তু মানুষকে পরিচালিত করে থাকে।

হ্যাঁ, মানুষ যখন আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে বসে তখনি মানবাত্মা দুর্বল

হয়ে পড়ে আর শয়তান সেই সুযোগ নিয়ে মানুষকে চালিত করে বিপথে। আমার বেলায় কিন্তু তা প্রযোজ্য নয়। আমি বিশ্বাস করি, আল্লাহ যাদের ভালবাসেন তাদের চলার পথের ইংগীতও তিনিই দান করে থাকেন যাতে তারা সুখী হতে পারে।

- একি তোমার আত্মবিশ্বাস?

- হ্যাঁ, এটা আমার আত্মবিশ্বাস। কারণ আল্লাহর মহব্বত না পাবার মত এমন কোন গুরুতর অপরাধ আমি করিনি।

- তাহলে শোন, আব্বা তোমার বিয়ে ঠিক করে ফেলেছেন।

- আব্বা আমার বিয়ে ঠিক করেছেন। কোথায়?

- তার এক বন্ধুর বিলেত ফেরত পুত্রের সঙ্গে। কথাবার্তা পাকাপাকি করার পর আজ এসেছিলেন মার কাছে তারিখ ঠিক করার জন্য।

- মা কি বলেছেন?

মা বলেননি কিছু। আমিই প্রতিবাদ করেছিলাম। কিন্তু তিনি কোন কথাই শুনতে চান নাই। তিনি বলেছেন, কথা যেখানে দেয়া হয়েছে বিয়ে সেখানেই হবে। তারপর বলে গেলেন, তোমাকে কথাটা জানিয়ে কাল তারিখের কথা জানাতে। পরে আমি মাকে সব খুলে বলেছি।

- মা কি বললেন?

মা আমার সাথে একমত। কিন্তু তার ক্ষমতা এখানে সীমিত। তিনি এ ব্যাপারে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। শামীমার কথা শুনে শাহিদা আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারল না, সে ভাবীকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। তারপর বলল– ভাবী, তুমি যেমন করে পার আব্বাকে ঠেকাও। আমি কখনি এ বিয়ে মেনে নিতে পারব না।

- আমার তো ঠেকাবার কোন ক্ষমতা নেই বোন, আমি সামান্য একজন নারী। আল্লাহকে ডাক, ঠেকাবার মালিক তো তিনিই। তবু আমি আব্বাকে আবার বলব।

তুমি হাসান ভাই সম্বন্ধে আব্বাকে এখনি কিছু বলোনা, তাহলে তার উপর গজব আসবে।

সে কথা তোমাকে বলে দিতে হবে না, আমি মাকেও বলতে নিষেধ করেছি। পরের দিন খান বাহাদুর সাহেব আবার স্ত্রীর ঘরে এসে জানতে চাইলেন তারিখটা কত দিন পর ঠিক করা ভাল হবে? শাহিনা বেগম স্বামীর কথার জবাব না দিয়ে বললেন, শাহিদা এ বিয়েতে রাজি না!

রাজি না। কি বলেছে সে?

বলেছে আমি এখন বিয়ে করব না।

বিয়ে করব না বললেই হলো। মেয়েদের যতদিন বিয়ে না হয় ততদিন বাপ-মায়ের উপর তাদের পাত্রস্থ করার দায়িত্ব থাকে। তাই সেই দায়িত্ব অবহেলা করে আমি গোনাহগার হতে পারি না।

আর বয়স্ক মেয়ের মতামতের বিরুদ্ধে জোর করে একজনের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে দায়িত্ব সম্পাদন করলে বুঝি সওয়াব হবে?

- আমি তাকে কোন ভিখেরীর ছেলের হাতে তুলে দিচ্ছিনা, তাই তার অমতেরও কোন কারণ দেখছি না।

- সব কারণই দেখা যায় না। বিয়েটা কোন অস্থায়ী বা সাময়িক ব্যাপার নয়। সারা জীবন একজন মানুষের সাথে যে সংসার করবে তার মতামতকে উপেক্ষা করার অর্থ জুলুম করা। আপনি এ বিয়ে বন্ধ করুন।

- অসম্ভব। আমি বুঝতে পেরেছি তোমরা সকলে চাও আমি অপদস্ত হই। ঠিক আছে, আমার কারো প্রয়োজন নেই, আমি নিজেই ব্যবস্থা করছি। বলেই তিনি যেভাবে এসেছিলেন সেভাবেই ফিরে গেলেন। শামীমা পাশের ঘর থেকে খান বাহাদুর সাহেবের উত্তেজিত কথাবার্তা শুনে সামনে আসার সাহস পায়নি। খান বাহাদুর রফিক আহমেদ স্ত্রীর ঘর থেকে ফিরে গিয়ে তখনি শরিফুল ইসলামকে টেলিফোন করে জানালেন, আগামী মাসের দশ তারিখে বিয়ের দিন স্থির করা হয়েছে, তুমি সেভাবেই প্রস্তুতি গ্রহণ কর। তিনি হাসানকেও ডেকে পাঠালেন বিয়ের খরচপত্র করা সম্বন্ধে পরামর্শ করার জন্য।

[নয়]

পাঠক আসুন, এবার রকিব ও পারভীনের জীবনের দিকে দৃষ্টি দেয়া যাক। রকিব ও পারভীনের বিয়ের পরের দিনগুলো আনন্দেই কাটছিল। পারভীনের বাড়ি থেকে তাদের বিয়ে মেনে নিলেও পারভীনের পিতা গফুর আহমেদ চৌধুরী শর্ত আরোপ করে বলেছেন, রকিব যদি তার পূর্ব স্ত্রীকে তালাক দিয়ে সম্পর্কচ্ছেদ করে তাহলেই পারভীন তার স্বামীসহ বাড়িতে আসার অনুমতি পাবে। অন্যথায় নয়। তিনি আরো বলেছেন, প্রথম শর্ত পালন না হলে দ্বিতীয় শর্ত থাকল, পারভীনকে তালাকের

মাধ্যমে ঐ স্বামী ছাড়তে হবে। এর প্রেক্ষিতে পারভিন প্রায়ই রকিবকে চাপ দিয়ে চলেছে বৌকে তালাক দিবার জন্য। কিন্তু রকিব দেই- দিচ্ছি করে সময় কাটিয়ে চলেছে। যার সূত্র ধরে ওদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রায়ই কথা কাটাকাটি হয়ে থাকে। ইদানিং রকিব লক্ষ্য করছে বিয়ের ব্যাপারটা প্রচার হবার পর থেকে পারভীনের বন্ধু-বান্ধবেরও আনাগোনা বেড়ে গেছে। যা রকিবের কাছে মোটেও সুখের নয়। সম্প্রতি আরো একটা উপস্বর্গ দেখা দিয়েছে, তাহলো বাড়ির মালিকের বড় ছেলে শহীদুল। শহীদুল ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে সবে বেরিয়েছে। থাকে ঐ বাড়িরই দোতলায়। হ্যান্ডস্যাম চেহারার সুন্দর যুবক শহীদুল। চট্পটে স্বভাব। মিষ্টি কথায় সহজেই মেয়েদের মন জয় করার কৌশলটি তার জানা। পারভিনকে প্রথম দেখেই শহীদুলের ভাল লেগে যায়। বাড়ির মালিকের ছেলে হিসাবে রকিবও প্রথম দিকে তাকে খাতির সম্মান করত। কিন্তু সেই খাতির-সম্মানের সূত্র ধরে শহীদুল পারভীনের অনেক কাছে পৌঁছে যায়। রকিব যখন কোর্ট থেকে ফিরে চেম্বারে চলে যায় তখনি পারভীনের পুরুষ বন্ধুরা এসে জমা হয়। অনেকগুলি সংস্কৃতি ও নাট্য প্রতিষ্ঠানের সাথে পারভীন পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকায় ঐ সমস্ত সংঘের সদস্যরা সেই সূত্র ধরে প্রায়ই আসে পারভীনের সাথে দেখা করতে। এদের মধ্যে শহীদুলই সার্বক্ষণিক সাহচার্য দিয়ে থাকে পারভীনকে। পারভীন রকিবকে বিয়ে করেছিল একমাত্র জিদের বশবর্তী হয়ে। রকিবের বৌয়ের সুখ্যাতি পারভীন সহ্য করতে পারে নাই। এই না পারার কারণ রকিবের প্রতি সে ছিল দুর্বল। হঠাৎ রকিবের বিয়ের খবরে তার মন ভেঙ্গে পড়ে। তার উপর বৌয়ের রূপগুণের সুখ্যাতি তার মনে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। সে সিদ্ধান্ত নেয় যেমন করে হোক রকিবকে কব্জা করে ঐ রূপবতী ও গুণবতীর স্বপ্ন সে ধুলায় মিশিয়ে দেবে। আর পারভীন তার সংকল্প বাস্তবে রূপ দিয়ে প্রমাণ করেছে নারীর কাছে পুরুষ কত অসহায়। সে আরো প্রমাণ করে আধুনিক প্রগতির যারা মানসকন্যা তারা ঘর বাঁধার চেয়ে বেশী পটু ঘর ভাঙায়।

অবসর সময়ে প্রায়ই পারভীন শহীদুলের সাথে বেড়াতে বের হয়। পার্কে, চিড়িয়াখানা, যাদুঘর ঘুরে ঘুরে দেখে তারা। রকিব সব দেখে-শুনেও বিশেষ কিছু বলে না। ভাবে আমি যখন সময় করে উঠতে পারি না তখন পারভীন যদি একটু ঘুরাফেরা করে আনন্দ পায় পাক না। আধুনিক সমাজে এ আর এমন দোষের কি? তাছাড়া শহীদুল তো অন্য কেউ নয়, বাড়ির মালিকেরই ছেলে। কিন্তু রকিব যেদিন বাসায় ফিরে দেখল পারভীন বিছানায় কাত হয়ে শুয়ে আছে

আর শহীদুল বিছানায় পারভীনের কোলের কাছে বসে হাসাহাসি করে গল্প করছে, তখনি যেন তার চমক ভাঙল। ঐদিন রকিবের শরীর খারাপ লাগায় নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই বাসায় ফিরে আসে। এসেই পারভীনের কোল ঘেষে বসে শহীদুলকে গল্প করতে দেখে তার মাথায় রক্ত চড়ে যায়। রকিব যতই শিক্ষিত হোক আর নিজেকে আধুনিক বলে দাবী করুক তার রক্তে যে শালীনতার ভাইরাস মিশে আছে তার প্রভাব থেকে সে মুক্ত হবে কিভাবে? তবু সে তখনি কিছু বলল না, অতিকষ্টে ধৈর্য ধারণ করে ঘরে ঢোকে। রকিব ঘরে ঢোকার সাথেই শহীদুল বিছানা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, এই যে ভাইজান এসে পড়েছেন। তারপর একটি চেয়ারে বসতে বসতে বলে এতক্ষণ ভাবীকে বিদ্যুতের একটা সাবজেক্ট বুঝাচ্ছিলাম। মানে আমাদের প্রাক্‌টিক্যাল পরীক্ষা কিভাবে হয়েছে তাই। শহীদুলের কথায় রকিব গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, কেন আপনার ভাবী আবার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বে নাকি?

- না, মানে বাই দা বাই বিদ্যুৎ উৎপাদনের কথা এসে গেল কিনা তাই সময় কাটাচ্ছিলাম। ভাইজান আপনি বরং চেম্বারটা বাসায় নিয়ে আসেন। এখানে রাত ৯টা পর্যন্ত একা একা থাকতে ভাবী হাপিয়ে ওঠেন।

- কেন, একা থাকবে কেন, আপনারা আছেন না?

হ্যাঁ, তা অবশ্য আছি। তবু আপনার থাকা আর আমাদের থাকা কি এক?

আমার তো মনে হয় বেশী উত্তম। রকিবের কথায় শহীদুল হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল। তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমি এখন আসি। বলেই সে বের হয়ে গেল। রকিব তার গমন পথ লক্ষ্য করে অধৈর্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। রকিবকে ওভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে পারভীন রকিবকে জিজ্ঞাসা করল, শহীদুল ভাইকে আমার বিছানায় বসা দেখে তুমি মাইন্ড করেছ?

না-না, মাইন্ড করব কেন? বসে না থেকে শুয়ে থাকলেও তো মাইন্ড করার কিছু ছিল না। কারণ আধুনিক প্রগতিবাদের ওটাইতো আসল রূপ। আর নারী স্বাধীনতার উদ্দেশ্যও তো তাই।

- দেখ, ওভাবে কুৎসিত ইংগীতপূর্ণ কথা বলোনা। এই আধুনিক প্রগতির জন্যই তো তুমি সেদিন হাঁপিয়ে উঠেছিলে। গেঁয়ো প্রতিক্রিয়াশীল বৌকে আধুনিক সমাজে নিতে না পেরে আমাকে নিয়ে পার্কে, সিনেমায় ও রেষ্টুরেন্টে ঘুরে বেড়িয়ে মনের সাধ মিটিয়েছিলে। আজ সেই আধুনিকতার বিরুদ্ধে কথা বলতে লজ্জা করছে না?

একথা বলে কি বুঝাতে চাচ্ছ আমাকে?

বুঝাতে চাচ্ছি, যে আধুনিকতার জন্য তুমি বাড়ি-ঘর, মা-বাপ ও স্ত্রীকে ত্যাগ করে এসেছ, এত তাড়াতাড়ি তার সখ মিটে গেল কিভাবে?

আধুনিকতার অর্থ কি বেলেল্লাপনা? আধুনিকতার অর্থ কি স্বামীর বিছানায় অন্য পুরুষকে জায়গা করে দেয়া? আমি জানতাম না আধুনিকতার রূপ এত কুৎসিত, এত জঘন্য।

- তা এখন যখন জেনে ফেলেছ, তখন কি করতে চাও?

কিছুই করতে চাইনা, শুধু বলতে চাই, আধুনিকতার অর্থ উলংগপনা নয়। ভদ্র-মার্জিতভাবেও আধুনিক জীবনযাপন করা যায়। সে দিকটায় খেয়াল রেখে চললেই খুশী হব। বলেই রকিব হাত মুখ ধোয়ার জন্য বাথরুমে গিয়ে ঢুকল। এরপর কয়েকদিন উভয়ের মধ্যে মন কষাকষি চললেও তা আবার স্বাভাবিক হয়ে আসে। এখন আর শহীদুলকে বেশী পারভীনের ঘরে আসতে দেখা যায় না। রকিব ভাবে আপদ দূর হয়েছে। ওরা আবার আগের মতই কোর্টে যায়, এক সাথে বাসায় ফেরে। আবার চা-নাস্তা খেয়ে রকিব সেরেস্তায় গিয়ে আগামী দিনের মামলার নথিপত্র ঠিক করে। পারভীনের মামলাগুলো রকিবই ঠিক করে দেয়। যার জন্য পারভীনকে সেরেস্তায় যাবার দরকার হয় না। সেদিন পারভীন সন্ধ্যার পর বিছানায় শুয়ে একখানা ইংরেজী ম্যাগাজিনের পাতা উল্টাচ্ছিল। এমন সময় পারভীনের এক বান্ধবী এসে ঘরে ঢুকল। পারভীন বান্ধবীকে দেখে খুশী হয়ে বলল, আরে শিরিন যে, আয়। অনেক দিন পর এলি, তা খবর কি?

- আমার খবর ভাল, তোর খবর শুনতে এলাম। হাসিমুখে বলে শিরিন।

আমার খবর বেশী ভাল না, চলছে কোন মতে নরমে-গরমে। জবাব দেয় পারভীন।

কোন মতে বলছিস কেন? রাজপুত্রের মত স্বামী যার শয্যাসঙ্গীনি তার তো মহা সুখে থাকার কথা।

মাকাল ফল, বুঝলি, একেবারে মাকাল ফল।

- মানে?

মানে ভীষণ কনজারভিটিভ। আগে মনে হয়েছিল প্রগতিবাদী। কিন্তু বিয়ের কিছুদিন পরই প্রগতিবাদ হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়ে মৌলবাদী চেহারা প্রকাশ হয়ে পড়ল। এখন আমি যদি আমার কোন কলেজ সহপাঠি বন্ধুর সাথে মিশি বা একটু হেসে কথা বলি তাহলেই উনি ক্ষেপে যান। তুই বল, ব্যক্তি স্বাধীনতা যাদের জন্মগত অধিকার তারা কি পিঞ্জিরায় আবদ্ধ হয়ে নিঃসঙ্গ জীবন-যাপন

করতে পারে?

তাহলে তো আমার আসাই বৃথা হয়ে গেল।

কেন? কি জন্যে এসেছিস? পারভীন কাজের বুঁয়াকে চা দিতে বলল। তারপর শিরিনের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলল, এখন বলতো তোর আসার সাথে ওর কন্‌জারভেশনের সম্পর্ক কি?

শোন, আমরা কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবী মিলে ঠিক করেছি কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে বেড়াতে যাব। আর তোকে করব আমাদের দলপতি। অবশ্য তোর সঙ্গে তোর স্বামীও থাকবেন। কিন্তু যা শুনলাম তাতে তিনি যাবেন বলেতো মনে হচ্ছে না।

ওঃ ভেরী চার্ম নিউজ। তুই চিন্তা করিস না, ও না গেলেও আমি যাব।

কিন্তু তোর স্বামী যদি যেতে বাধা দেয়?

- বাধা দিলেও আমি যাব।

কিন্তু তা কি ঠিক হবে? তার কথা অমান্য করে আমাদের সাথে গেলে তোর যদি কোন ক্ষতি হয়?

হোক। ক্ষতির চরম পর্যায় বিচ্ছেদ। বাংলাদেশে স্বামীর অভাব নেই, কিন্তু বিনোদনের এ সুযোগ জীবনে আর নাও আসতে পারে।

সাব্‌বাস! তুই আমাকেও হার-মানালি। আমি প্রগতিবাদে বিশ্বাসী হলেও তোর মত অত সাহস আমার নেই। কিন্তু তোর স্বামী যদি না যায় তাহলে আর একটা সমস্যা দেখা দেবে। তুইসহ আমরা মেয়ে হলাম পাঁচজন, আর ছেলে চারজন। তোর স্বামী গেলে আর কোন প্রবলেম থাকত না। কিন্তু তিনি যদি না যান তাহলে–

- বেজোড় হয়ে যাব এইতো?

- হ্যা, মানে বিদেশ বাড়ি, নিজের নিরাপত্তার জন্যই সাহসী পুরুষ সাথে থাকা দরকার।

তার জন্য চিন্তা নেই। প্রগতির ভান্ডার কি তুই এতই ছোট মনে করিস? সেখানে কি উৎপাদন কম হচ্ছে? রকিবকে আমি অনুরোধ করব, সে যদি রাজি না হয় তার জন্য শহীদুল ভাই আছে।

শহীদুল আবার কে?

এই বাড়ির মালিকের ছেলে, ইঞ্জিনিয়ার, খুব স্মার্ট এবং বাকপটু। তাছাড়া সাহসীও। তা তোরা কবে যাবি?

আগামী সপ্তাহেই তো যাবার কথা। আমি আজ গিয়ে দিন ঠিক করে তোকে জানাব।

কালই জানাবি কিন্তু।

ঠিক আছে। আজ তাহলে আমি উঠি। শিরিন ওঠে চলে গেল, পারভীন ভ্রমণের আনন্দে গুনগুন করে গানের কলি ভাজতে ভাজতে বিছানায় গা এলিয়ে দিল। রকিব রাত সাড়ে ৯টায় সেরেস্তা থেকে ফিরে খাওয়া শেষ করে যখন শুতে যাবে তখনি পারভীন কথাটা তুলল রকিবের কাছে। রকিব শুনে প্রথমে বলল, পর পর কয়েকটা জটিল মামলার তারিখ থাকায় তার সময় হবে না। পরে অবসর সময় দু'জন গিয়ে বেড়িয়ে আসা যাবে। জবাবে পারভীন জানাল, একা একা যাওয়া আর দল বেঁধে যাওয়ার ইমেজ কি তুমি এক মনে কর?

-এখানে ইমেজের কি আছে? কক্সবাজার সাগর সৈকত দেখা আসল উদ্দেশ্য হলে দলের দরকার আছে বলে তো আমার মনে হয় না।

- দেখ, বন্ধু-বান্ধব নিয়ে দল বেঁধে কোথাও যাওয়া আর একা একা যাওয়ায় কি একই আনন্দ?

তুমি তো একা যাচ্ছ না, আমিও তো তোমার সাথে যাচ্ছি।

তুমি যাওয়া আর একা যাওয়া একই কথা।

- ওঃ তাহলে বন্ধুদের সঙ্গ লাভই তোমার আসল কাম্য!

- বন্ধুদের সঙ্গ লাভ নয়, আনন্দ লাভ। মানুষের জীবনে রিক্রিয়েশনের প্রয়োজন আছে।

তুমি ভুলে যাচ্ছ কেন, তুমি বিবাহিতা! বিবাহিত মেয়েরা ইচ্ছা করলেই সবকিছু করতে পারে না।

দেখ, বিয়ে করার অর্থ নিজের ব্যক্তি স্বাধীনতা বিকিয়ে দেয়া নয়। ওটা মৌলবাদী সমাজে চলে, প্রগতিবাদী সমাজে নয়। তুমি সব দেখে-শুনেই আমাকে বিয়ে করেছ।

হ্যাঁ, দেখেই বিয়ে করেছিলাম, সে দেখাছিল বাইরের। ভিতরের কুৎসিত চেহারাটা তখন ধরা পড়েনি। এখন বুঝতে পারছি, তোমরা যাকে প্রগতিবাদ বলো, আসলে সেটা নাস্তিকতাবাদ।

- আমি তোমার সাথে তর্ক করতে চাইনা, তুমি যাবে কিনা তাই জানতে চাই।

- আমি তো বলেছি, এখন আমার পক্ষে ঢাকার বাইরে যাওয়া সম্ভব নয়।

তুমি না গেলেও আমি যাব। আমি আমার বান্ধবীকে কথা দিয়েছি।

সেটা তোমার অভিরুচি। স্বামীর কথার উপর যদি বান্ধবীর কথার গুরুত্ব

তোমার কাছে বেশী মনে হয়, তুমি যেতে পার।
রকিবের মুখ থেকে এই কথাটা শোনার জন্য পারভীন উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছিল। রকিবের মুখ থেকে যখনি বের হলো, তুমি যেতে পার তখনি ঝগড়া বন্ধ হয়ে গেল। পারভীন আর কথা না বাড়িয়ে শুয়ে পড়ল। রকিব কিছুক্ষণ নিশ্চুপ বসে থেকে বলল, তোমার বিদেশীনির দাম্পত্য অধিকারের মামলার আরজি তৈরী হয়ে গেছে, ওটা কাল দাখিল করে দিও।
কয়েকদিন আর কোন কথা নেই। শিরিন পরের দিনই পারভীনকে তারিখ জানিয়ে দিয়েছে। মাঝে আর মাত্র চারটা দিন বাকী। পারভীন যখন দেখল রকিব যাবে না তখন শহীদুলকে প্রস্তাব দিতেই শহীদুল এক কথায় রাজি হয়ে গেল। শহীদুল এমন একটা সুযোগের অপেক্ষায়ই ছিল। তাই কোন ওজর-আপত্তিই সে করল না। পারভীনের সকল প্রস্তুতিই শহীদুল নিজ দায়িত্বে সম্পাদন করে ফেলল। ভ্রমণকারীদের অনেকেরই গাড়ী আছে, কিন্তু গাড়ী কেউ নিবেনা, তারা বাসে যাওয়ারই সিদ্ধান্ত নিল। অনেকে আবার প্লেনে যাবার বায়না ধরল। কিন্তু প্লেনে গেলে ভ্রমণের আনন্দ নষ্ট হবে, তাই শেষ পর্যন্ত সকলেই একমত হয়ে বাসের টিকিট কাটতে মনস্থ করল। শিরিন জানাল আমরা এসি গাড়ীতে যাব, তুই টাকা পাঠিয়ে দিস। পারভীন কথাটা শহীদুলকে বলতেই শহীদুল ঠিকানা নিয়ে ছুটল। যাবার আগের দিন পারভীন রকিবকে বলল, আমি কাল যাচ্ছি, ফিরতে সপ্তাহখানেক দেরি হবে।
- তাহলে তুমি যাবেই?
হ্যাঁ, টিকিট কাটা হয়ে গেছে। শহীদুল ভাইও আমাদের সাথে যাচ্ছে। আমার মামলাগুলোর হাজিরা তুমি সই করে দিও। বিদেশীনির মামলার নোটিশ দেয়া হয় নাই, মুহুরী সাহেবকে বলেছি নোটিশ লিখে দাখিল করতে। রকিব সব শুনল কিন্তু একটা কথাও বলল না। বিশেষ করে শহীদুলের কথা শোনার পর আর প্রবৃত্তি হলোনা কথা বলতে। সে কোর্টে চলে গেল, পারভীন আজ আর কোর্টে গেল না। রকিব কোর্টে গেলেও কাজে মন বসাতে পারল না। একটি মামলার হিয়ারিং-এর দিন থাকলেও মানসিক দুঃশ্চিন্তার কারণে সময়ের জন্য দরখাস্ত দাখিল করল রকিব। পারভীনের ব্যবহারে রকিবের মর্মপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে কিছুতেই পারভীনের এই স্বাধীনতা মেনে নিতে পারছেনা। সে বুঝতে পারছে, পারভীন যা করছে তা ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এইসব মেয়ে কখনি সংসার জীবনে সুখী

হতে পারে না। আজ বার বার তার শামীমার মুখখানাই চোখের সামনে ভেসে উঠছে। সে শামীমার সাথে পারভীনের তুলনা করতে গিয়ে দেখতে পেল, একটি নিষ্পাপ অক্ষত সজিব গোলাপের পাশে একটি হাজারো কীটে দংশিত বৃন্তচ্যুত বেলফুল। যার না আছে কোন সুগন্ধ, না আছে কোন গুণ। শামীমার স্বামীভক্তি ও সেবার কাছে পারভীনের দাম্ভিকতা ও উচ্ছৃংলতা চিন্তা করে রকিব নিজেকে নিজেই ধিক্কার দিতে থাকে। রকিব ভাবতে থাকে, মোহের বশবর্তী হয়ে যে জগতে সে পা দিয়েছে আসলেই এ জগত শয়তানের জগত। সে জান্নাত ছেড়ে জাহান্নামে নেমে এসেছে। এযেন আদম (আঃ)-এর গন্দম খাওয়ার অপরাধে জান্নাত থেকে দুনিয়ায় অবতরণ আর কি! কিন্তু এখন উপায়? এখন তো ফিরে যাবার পথ নেই। আমি যে অপরাধ করেছি এ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত কি-সে? শামীমা কি আর আগের মত পারবে আমাকে গ্রহণ করতে? আব্বা, মা, শাহিদা ওদের চোখেও তো আমি একটা সমাজবিরোধী অপরাধী ছাড়া আর কিছু না। কোর্ট থেকে বের হয়ে এই সব চিন্তা করতে করতে অন্যমনোস্ক হয়ে রকিব পথ হাঁটছিল। সামনে খালি রিক্সা না পেয়ে রিক্সা স্ট্যান্ডের দিকে অবনত মস্তকে এগিয়ে যাচ্ছিল রকিব। হঠাৎ পিছন থেকে একটি মটর সাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রকিবের উপর এসে পড়তেই রকিব প্রায় দশ ফুট দূরে গিয়ে ছিটকে পড়ে। পিছন থেকে ধাক্কা মারায় সে ফুটপাথের উপর গিয়ে ছিটকে পড়ে। বুকে ও মাথায় আঘাত লাগায় সাথে সাথে সে অজ্ঞান হয়ে যায়। কোর্ট শেষ হওয়ায় অনেক আইনজীবিই তখন রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে। রাস্তার পাশে ভিড় দেখে কয়েকজন এডভোকেট এগিয়ে গিয়ে তাদেরই সহপাঠি রকিবকে পড়ে থাকতে দেখে তাড়াতাড়ি গাড়ীতে তুলে নিয়ে মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যায়। সাথে সাথে কথাটা ছড়িয়ে পড়ে কোর্ট প্রাঙ্গণে। রকিবের মুহুরী তখন কোর্টেই ছিল। সে শুনামাত্র রিক্সা নিয়ে বাসায় গিয়ে পারভিনকে খবরটা পৌঁছে দিয়েই ছোটে মেডিক্যাল মুখে। পারভীন খবর পেয়ে যখন মেডিক্যাল কলেজের জরুরী বিভাগে পৌঁছল তখনো রকিবের জ্ঞান ফেরেনি। তাকে ইমার্জেন্সী বিভাগে স্পেশাল কেয়ারে রাখা হয়েছে। ডাক্তার বলেছে এক্স-রে না করা পর্যন্ত আঘাতের ধরন বলা যাবে না। তবে আঘাতটা বড় বলেই মনে হচ্ছে। কপালের উপরটাও কেটে গেছে। এখনি এক্সরে করা হবে এবং হাড় ভেঙে থাকলে অপারেশন করতে হবে। হঠাৎ এ ঘটনায় পারভীন পড়ে মহাবিপদে। একদিকে ভ্রমণের সব প্রস্তুতি শেষ, কাল ভোরেই রওনা হতে হবে, অন্যদিকে রকিবের এই ঘটনা তাকে ভাবিয়ে তোলে।

পারভীন ভাবে একি তবে তার কক্সবাজার যাবার বাধার সংকেত? পরক্ষনেই এ চিন্তা মন থেকে দূর করে ভাবে এসব কি কুসংস্কারের কথা সে চিন্তা করছে? এ ঘটনা স্রেফ দুর্ঘটনা, তার সাথে ভ্রমণের কি সম্পর্ক? সে আজেবাজে চিন্তা মন থেকে মুছে ফেলে এখন তার কি করনীয় তাই চিন্তা করতে থাকে। ডাক্তার বলেছে রাতে রোগীর জ্ঞান নাও ফিরতে পারে। এখন রোগীকে এক্সরে, প্রয়োজনে অপারেশন, সেলাই ব্যান্ডেজ করা হবে। তাই সে আর মেডিক্যালে থাকার প্রয়োজন মনে করে না। আর থেকেই বা কি লাভ। রোগীর সাথে দেখা করার কোন সুযোগ নেই। আর অজ্ঞান রোগীর সাথে দেখা করেই বা কি হবে? এই সব ভেবে সে মুহুরী সাহেবকে একশত টাকার একখানা নোট দিয়ে বলল, আপনি রাতে এখানেই থাকবেন, এর মধ্যে যদি জ্ঞান ফিরে আসে এবং আমার কথা জিজ্ঞাস করে বলবেন, মেম সাহেব অনেক রাত পর্যন্ত থেকে বাসায় গেছে। আর আপনি রোগী কেমন থাকে ভোরে আমাকে জানাবেন। বলেই পারভীন বাসায় চলে এলো। বাসায় এসে ডায়েরী খুলে সে রকিবের আব্বার টেলিফোন নম্বর একটি কাগজে টুকে নিয়ে উঠে গেল দোতলায়। শহীদুল রুমেই ছিল। পারীভন শহীদুলকে রকিবের দুর্ঘটনার খবর জানিয়ে টেলিফোন চাইল। শহীদুল পাশের রুম থেকে টেলিফোন সেট এনে সংযোগ দিয়ে পারভীনের হাতে দিল। পারভীন খান বাহাদুর রফিক আহমেদকে রিং করে বলল, আপনার ছেলে এডভোকেট রকিব আহমেদ অ্যাক্সিডেন্ট করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে জরুরী বিভাগে আছে। তার অবস্থা সংকটাপন্ন, আপনারা এক্ষুনি আসুন। খান বাহাদুর জানতে চাইলেন আপনি কে বলছেন? পারভীন জবাব দিল, আমি হাসপাতাল থেকে বলছি। বলেই সে টেলিফোন রেখে দিল এবং শহীদুলকে তার ঘরে আসতে বলে নিজের ঘরে চলে এলো। খান বাহাদুর সাহেব টেলিফোন পেয়ে নির্বাক দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। ভাবলেন এমন অবাধ্য ছেলেকে দেখতে তিনিও যাবেন না, কাউকে যেতেও দেবেন না। -- খবরটা তিনি বাড়ির কাউকেই জানাবেন না। কিন্তু তিনি যতই কঠোর হোন না কেন, পারলেন না নিজেকে ধরে রাখতে। রক্তের টান তাকে কঠোর হয়ে থাকতে দিলনা। তিনি সংবাদটা বাড়ির সকলকেই জানালেন, খবর শোনার সাথে সাথে বাড়িতে শোকের ছায়া নেমে এলো। শাহিনা বেগম কান্নায় ভেঙে পড়লেন, শামীমা বার বার অজ্ঞান হয়ে পড়তে লাগল। শাহিনা বেগম হাসানকে বললেন, গাড়ী বের কর আমি মেডিকেলে যাব। শুনে খান বাহাদুর

সাহেব বললেন, আগে হাসান গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসুক। যেতে হলে পরে যাবে। খবরটা মিথ্যাও তো হতে পারে? তিনি হাসানকে বললেন, তুমি গিয়ে খবরটা আগে নিয়ে এস।

হাসান যখন হাসপাতালে গিয়ে পৌঁছল তখন সেলাই ব্যান্ডেজ হয়ে গেছে। বুকের কোন হাড় না ভাঙায় অপারেশন করতে হয় নাই, তবে মাথা কেটে যাওয়ায় সেলাই ব্যান্ডেজ করতে হয়েছে। আঘাতটা মাথায় জোরে লাগায় জ্ঞান ফিরতে দেরি হচ্ছে। বুকের হাড় না ভাঙলেও বেশ খানিকটা কেটে গেছে। বুকেও ব্যান্ডেজ করতে হয়েছে। হাসান গিয়ে দেখে একমাত্র মুহুরী সাহেব ছাড়া আর কেউ সেখানে নেই। হাসান জিজ্ঞাসা করল, আর কেউ আসেনি? মুহুরী সাহেব জবাব দিলেন, মেম সাহেব এসেছিলেন সন্ধ্যায়। এসেই বাসায় চলে গেছেন। আর সাহেবের কয়েকজন বন্ধু এসে ছিলেন, তারা বাইরে গেছেন। হাসান আর দেরী না করে ডাক্তারের সাথে কথা বলে একটি ক্যাবিন ঠিক করল এবং অজ্ঞান অবস্থায়ই রোগীকে ক্যাবিনে স্থানান্তরিত করল। এমন সময় রকিবের তিনজন এডভোকেট বন্ধু বাইরে থেকে ফিরে এসে হাসানকে রোগীর পাশে দেখে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় হাসান যখন বলল, আমি রকিবের ভাই, এখান থেকে টেলিফোনে খবর পেয়ে এসেছি তখন তারা কিছুটা অবাক হয়ে বলল, এখান থেকে টেলিফোন আবার করলকে? টেলিফোন তো এইমাত্র আমরা করে এলাম। যাই হোক, আপনি এসে পড়েছেন ভালই হলো। আমরা কোর্ট থেকে কেউ বাসায় যাইনি। সোজা এখানে চলে এসেছি। হাসান তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলল, আপনারা অনেক কষ্ট করেছেন, আপনারা এখন বাসায় যান। রোগীর মা ও অন্যরা এখনি এসে পড়বেন। হাসান এডভোকেটদের বিদায় দিয়ে মুহুরী সাহেবকে বলল, যে নার্সের ডিউটি আছে তাকে ডেকে আনেন। নার্স আসলে নার্সের হাতে একখানা পঞ্চাশ টাকার নোট দিয়ে বলল, আমি পল্লবী যাব আর আসব, এই সময়টা আপনি রোগীর খেয়াল রাখবেন। আর মুহুরী সাহেবকে বলল, আপনিও থাকবেন, আমি ঘুরে এসে আপনাকে ছুটি দিব। বলেই হাসান বের হয়ে গেল। বাড়িতে গিয়ে দেখতে পেল শাহিনা বেগম, শামীমা ও শাহিদা প্রস্তুত হয়ে তারই অপেক্ষা করছে। সে খান বাহাদুরকে সব রিপোর্ট বলে আবার সকলকে নিয়ে ছুটল মেডিকেলের দিকে।

[দশ]

তখনো রকিবের জ্ঞান ফেরেনি। ওরা হাসপাতালে পৌঁছে মুহুরী সাহেবকে বিদায় করে দিয়ে সবাই ক্যাবিনে গিয়ে ঢুকল। রকিবের মাথায় ও বুকে ব্যান্ডেজ করা হয়েছে। নিঃশ্বাস পড়ছে কিনা দূর থেকে বোঝা যাচ্ছে না। রকিবের অবস্থা দেখে শাহিনা বেগম ও শামীমা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। হাসান বাঁধা দিয়ে বলল, রোগীর ঘরে কান্না-কাটি করলে রোগীর ক্ষতি হবে, জোরে কোন কথা বলবেন না কেউ। শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় সকলেই অপেক্ষা করতে থাকল রকিবের জ্ঞান ফেরার জন্য। এরমধ্যে একজন ডাক্তার এসে দেখে গেল রোগীকে। হাসান ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করল, কেমন দেখলেন? ডাক্তার জবাব দিল ভয়ের কোন কারণ নেই। শেষ রাতের দিকে রোগীর জ্ঞান ফিরে আসবে। জ্ঞান ফেরার সাথে সাথে ডাক্তারকে খবর দিবেন। রোগীর সাথে আপনারা কোন কথা বলবেন না। ডাক্তার চলে গেলে হাসান বলল, খালাম্মা, আপনারা সবাই বাসায় যান। হাসানের কথা শুনে শামীমা বলল, মা আর শাহিদা যাক আমি যাবনা। শাহিনা বেগম বললেন, তুইতো কিছুই খেয়ে আসিসনি, সারা রাত না খেয়ে থাকবি কি করে? শামীমা বলল, আমার ক্ষুধা নেই মা, আমি থাকতে পারব। হাসান ভাইজান আপনাদের রেখে আসলেই হবে। এবার শাহিদা বলল, আমিও ভাবীর সাথে থাকি মা, তুমি বাসায় যাও। শেষ পর্যন্ত শাহিনা বেগম আঁচলে চোখের পানি মুছতে মুছতে ফিরে গেলেন বাসায়।

হাসান বাসায় ফিরে নিজে কিছু খেয়ে এবং ওদের দু'জনের জন্য খাবার নিয়ে যখন হাসপাতালে পৌঁছল তখন রাত বারটা বেজে গেছে। শাহিদা শামীমাকে খেতে বলায় শামীমা বলল– তুমি খেয়ে নাও, আমার ক্ষুধা নেই, আমি এখন খাব না। অনেক সাধা-সাধির পরও যখন শামীমা খেতে রাজি হলো না, তখন শাহিদা সামান্য কিছু মুখে দিয়ে উঠে পড়ল। আর শামীমা রকিবের পায়ের কাছে তার মুখের দিকে পলকহীন নেত্রে তাকিয়ে রইল কখন তার স্বামীর জ্ঞান ফিরবে আর কখন সে স্বামীর চোখে চোখ রেখে মনের জমানো ব্যথা চোখের ভাষায় প্রকাশ করবে। হাসান আগেই দোতলার বেলকনিতে দাঁড়িয়ে আনমনে তাকিয়ে ছিল দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। এমন সময় শাহিদা হাসানের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ কারো মুখেই কোন কথা ছিল না। শেষে হাসানই সে নীরবতা

ভঙ্গ করে বলল. আমি তোমাকে আগেই বলেছিলাম শাহিদা. এ পথ বড় কন্টকাকীর্ণ। খালুজান আমাদের ব্যাপারটা এখনো জানেন না। যখন শুনবেন তখন আমার জন্য যে বেদনার সৃষ্টি হবে তা সহ্য করা আমার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়বে।

আর সে বেদনা বুঝি আমার জন্য হবে সুখকর? বলল, শাহিদা।

না, সে কথা আমি বলছিনা। আমি ভাবছি এর শেষ পরিণতি কোথায়?

হাসান ভাই, সতী নারীর জীবনে কোন পুরুষ একবারই আসে, বারবার আসেনা। আমার জীবনেও তার ব্যতিক্রম হবে না। বিয়ে ঠেকাতে না পারলে জীবনটা তো দিতে পারব। এতে তো কেউ বাধা দিতে পারবেনা। শাহিদার কথা শুনে হাসান চমকে ওঠে। বলে, সাহিদা ও কথা মুখে এনো না। জীবনটা তোমার হিফাজতে থাকলেও ওটা আল্লাহর দান। আর আল্লাহর দেয়া সম্পদ রক্ষা করা ঈমানী দায়িত্ব, ধ্বংস করা নয়।

- তা আমিও জানি। কিন্তু আব্বা যেভাবে মা ও ভাবীকে বলেছেন, তাতে তিনি তাঁর কথার নড়চড় করবেন না। শুনলাম তিনি দিন-তারিখও জানিয়ে দিয়েছেন।

- হ্যাঁ, আমাকে ডেকেছিলেন কিভাবে কি করা হবে তার পরামর্শ করার জন্য। আজ আবার বসার কথাছিল। রকিবের দুর্ঘটনার খবর শোনায় আর বসা হয় নাই। হয়তো তিনি কাল আবার আমাকে ডাকবেন। এমন সময় শামীমাকে আসতে দেখে ওরা কথা বন্ধ করে আগ্রহের দৃষ্টিতে তাকাল শামীমার দিকে। শামীমা কাছে এসে কান্না জড়িত কণ্ঠে বলল, এখনো জ্ঞান ফিরে এলোনা ভাইজান? হাসান সান্ত্বনা দিয়ে বলল, ডাক্তার বলেছে শেষ রাতের দিকে জ্ঞান ফিরবে। তাছাড়া ডাক্তার তো বলেছেই ভয়ের কোন কারণ নেই। আপনি অধৈর্য হবেন না ভাবী, আল্লাহকে ডাকতে থাকুন।

কিন্তু ওঁর জ্ঞান না ফেরা পর্যন্ত আমি যে মনকে কিছুতেই প্রবোধ দিতে পারছিনা ভাইজান।

খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু তবুতো মনকে সান্ত্বনা দিতেই হবে ভাবী। ওরা বলতে বলতে আবার ক্যাবিনে ফিরে এলো। হাসান বাসা থেকে বিছানা নিয়ে এসেছিল। সে নীচে বিছানা বিছিয়ে দিয়ে বলল– ভাবী, আপনি ও শাহিদা শুয়ে একটু আরাম করুন আমি জেগে আছি। কিন্তু শামীমা কিছুতেই শুতে রাজি হলোনা। সে আবার টুলে গিয়ে বসল রকিবের পায়ের কাছে। অগত্য শাহিদা কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়ার জন্য বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে গেল। হাসানও দূরে একখানা সোফায় বসে ঝিমুতে লাগল। একমাত্র

ঘুম নেই শামীমার চোখে। সে স্বামীর পায়ের কাছে বসে চিন্তার সাগর পাড়ি দিতে লাগল। শামীমা ভাবতে লাগল, স্বামী যখন জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখবে আমি তার পাশে বসে আছি তখন তার প্রতিক্রিয়া কি হবে? সেকি আমাকে তার পাশে মেনে নিতে পারবে, না ঘৃণায় মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে তার নতুন স্ত্রীকে খুঁজবে? আবার ভাবতে লাগল, নতুন স্ত্রী যখন কাল সকালে এসে তার স্বামীর পাশে আমাকে দেখবে তখনি বা ব্যাপারটা কিভাবে নেবে? যদি সে এসে বলে তুমি যাও, তোমার আর আসার দরকার নেই এবং তার সেই নির্দেশকে যদি স্বামীও নীরব সমর্থন জানায় তাহলে আমি কি পারব সে অপমান সহ্য করতে? তার চেয়ে যে আমার মৃত্যুই হবে শ্রেয়; এই ধরনের নানা কথা ভাবতে ভাবতে শামীমার দুই গন্ড বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল।
তখন রাত দু'টো। শামীমা লক্ষ্য করল রকিবের ঠোঁট দু'টো যেন একটু নড়ে উঠল। তারপর ধীরে ধীরে চোখের পাতা উঠা নামা করতে লাগল। তা দেখে শামীমা হাসানকে গিয়ে বলল, ভাইজান ডাক্তারকে খবর দেন, ওর জ্ঞান ফিরে আসছে। হাসান ঘুমিয়ে পড়েছিল, শামীমার ডাকে তাড়াতাড়ি ওঠে চলে গেল ডাক্তারকে খবর দিতে। এদিকে রকিব কয়েকবার চেষ্টা করার পর চোখের পাতা খুলল বটে; কিন্তু সব ঝাপসা দেখতে লাগল, তার পাশে বসা শামীমাকেও সে চিনতে পারল না। সে আবার চোখ বন্ধ করল। এমন সময় হাসান একজন ডাক্তার ও নার্সসহ ক্যাবিনে এসে ঢুকতেই শামীমা উঠে দূরে সরে গেল। ডাক্তার রকিবের পাশে দাঁড়িয়ে নাড়ি দেখার জন্য হাত ধরতেই রকিব আবার চোখের পাতা খুলে ক্ষীণ কন্ঠে উচ্চারণ করল, কে? আমি ডাক্তার। রকিব আবার উচ্চারণ করল, আমি..... ডাক্তার তার মুখে হাত রেখে বললেন, কথা বলবেন না। তারপর নার্সকে নির্দেশ দিলেন,রোগীকে এখনি স্যালাইন পুশ কর, রোগী খুবই দুর্বল। সে লোক চিনতে পারছেনা। স্যালাইনের সাথে একটা ঘুমের ইনজেক্শন দিয়ে দাও। তারপর হাসানকে বললেন, রোগীকে কোনরূপ ডিসটার্ব করবেন না। ডাক্তার চলে গেলে নার্স স্যালাইন দিয়ে বলল, স্যালাইন শেষ হলে আমাদের ডাকবেন। নিজেরা খুলবার চেষ্টা করবেন না। পরের দিন বেলা দশটায় স্যালাইন শেষ হলো। নার্স এসে স্যালাইন খুলে দিয়ে বলে গেল আপনা থেকে ঘুম না ভাঙা পর্যন্ত ডাকবেন না। শাহিনা বেগম ফজরের নামাজ আদায় করে নাস্তা ও ফ্লাক্স ভরে চা নিয়ে মেডিকেলে চলে এসেছেন। তিনি এসেই শামীমা-শাহিদাকে বাড়ি যাবার জন্য তাগাদা দিলেন, কিন্তু শামীমা রকিবের জ্ঞান ভালভাবে না ফেরা পর্যন্ত কিছুতেই বাড়ি যেতে রাজি হলো না। অগত্য শাহিনা বেগমের বয়ে আনা নাস্তা খেয়ে

হাসান ও শাহিদা বাসায় চলে গেল। শাহিনা বেগম বললেন দুপুরে তোমরা খেয়ে শামীমার খাবার নিয়ে এস, আমি বাড়ি গিয়ে খাব। নার্স স্যালাইন খুলে যাবার আরো এক ঘন্টা পরে রকিবের ঘুম ভাঙল। শামীমা আগের মতই রকিবের পায়ের কাছে বসেছিল। রকিব চোখ খুলে পায়ের কাছে অশ্রু সজল চোখে শামীমাকে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বসে থাকতে দেখে অনেক্ষণ এক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল। শামীমা লক্ষ্য করল রকিবের চোখের পাতাও ভিজে উঠেছে। তা দেখে শামীমার ভিতরের সব আবেগ এক সাথে বের হয়ে আসতে চাইল। কিন্তু ডাক্তারের নিষেধ ও স্বামীর অমঙ্গলের কথা চিন্তা করে দাঁতে ঠোঁট কামড়িয়ে ধরে মস্তক অবনত করল। তারপর যখন আবার মাথা উঠাল তখন রকিব হাত ইশারায় তাকে কাছে ডাকল। শামীমা সে ডাকে সাড়া দিয়ে এগিয়ে গিয়ে তার পাশে বসতেই রকিব হাত উঁচু করে শামীমার মাথার উপর তুলতেই শামীমা মাথা নীচু করে স্বামীর বুকের উপর রাখল। রকিব শামীমার মাথায় হাত রেখে যখন আদর করতে লাগল তখন দূরে দাঁড়িয়ে মা শাহিনা বেগম তা দেখে আনন্দ অশ্রুতে বুক ভাসাতে লাগলেন। রকিব এখনো জানে না তার মাও সেখানে উপস্থিত আছেন। শামীমাকে ক্ষীণকণ্ঠে রকিব জিজ্ঞাসা করল মা, আব্বা? শামীমা তা শুনে মাথা তুলে শাহিনা বেগমের দিকে তাকাতেই তিনি কাছে এসে দাঁড়ালেন। শামীমা আবার রকিবের পায়ের কাছে গিয়ে বসল। শাহিনা বেগম ছেলের পাশে বসে তার মুখের দিকে তাকিয়েই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। রকিবের দুই গন্ড বেয়েও অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল। রকিব হাত বাড়িয়ে মায়ের চোখের পানি মুছে দিতে দিতে বলল– মা, তোমরা আমাকে ক্ষমা করতে পারবে না? আমি যে অপরাধ করেছি সে অপরাধের প্রায়শ্চিত কি তোমরা আমাকে করতে দেবে? রকিবের কথায় শাহিনা বেগমের মাতৃ হৃদয় উতালপাতাল করে উঠল। তিনি কোন মতে অশ্রু সম্বরণ করে বললেন খোকা ও কথা বলিসনে বাপ। মা কি কখনো তার সন্তানকে ফেলে দিতে পারে? তিনি শামীমার দিকে তাকিয়ে বললেন, চেয়ে দেখতো ঐ নিষ্পাপ মুখখানার দিকে। তোর চিন্তায় শরীরটা কি করে ফেলেছে। কাল সন্ধ্যা থেকে দানা-পানি ছেড়ে একইভাবে বসে আছে। এতেও কি তুই বুঝতে পারিস না, রক্ত কখনো পৃথক হয়না। রকিব মায়ের কথা শুনে আপ্লুত হলো, কিন্তু বলল না কিছু। তার দু'টি চোখ থেকেও নীরব অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল, শাহিনা বেগম আঁচলে সে অশ্রু মুছে দিতে লাগলেন। এমন সময় কয়েকটি কমলা লেবু হাতে রকিবের মুহুরী সাহেব ঢুকলেন ক্যাবিনে। কিন্তু রকিবের পাশে দু'জন মহিলাকে দেখে তিনি পিছিয়ে গেলেন। শাহিনা বেগম ও শামীমা তা দেখে

সেখান থেকে উঠে বেলকনিতে গিয়ে দাঁড়ালেন। মুহুরী সাহেব রকিবকে সুস্থ্য দেখে আলহামদুলিল্লাহ বলে আল্লাহর শুকুর আদায় করে বললেন, মেম সাহেব সকালে উঠে চাবি আমাকে দিয়ে চলে গেছেন স্যার। আমি নিষেধ করে বললাম সাহেবের এত বড় একটা দুর্ঘটনা হতে দেখেও আপনার যাওয়া ঠিক হবে না। তিনি বললেন, আমি তোমার সাহেবের বাড়িতে ফোন করে জানিয়ে দিয়েছি। তারাই দেখাশোনা করবেন। মুহুরী সাহেবের কথা শুনে রকিব বলল, আমি বুঝতে পারছি আমার কিছু হয়েছে, কিন্তু কি হয়েছে তা বুঝতে পারছি না। রকিবের কথা শুনে মুহুরী সাহেব বুঝতে পারলেন সাহেব স্মরণ করতে পারছেন না অ্যাকসিডেন্টের কথা। তাই তিনি ঘটনা বিবৃতি করে শোনালেন। তারপর ঘরের চাবি বের করে বললেন, চাবিটা রাখবেন স্যার?

- না ওটা আপনার কাছেই রাখুন। মুহুরী সাহেব উঠে চলে গেলেন।

এদিকে শাহিনা বেগম ও শামীমা বেলকনিতে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন। শাহিনা বেগম শামীমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যাঁরে শামীমা রকিবের নতুন বৌকে তো কাল থেকে একবারও দেখলাম না, তুই দেখেছিস?

আমিও তো তাই ভাবছি মা। কাল সন্ধ্যায় নাকি এসেছিল শুনলাম, কিন্তু তারপরতো আর একবারও আসল না। মনে হয় আমাদের সামনে আসতে লজ্জা পাচ্ছে-এ জন্য আসছে না, বাইরে থেকে নিশ্চয়ই খবর নিচ্ছে।

- রকিব ওর কথা তোকে কিছু জিজ্ঞাসা করেনি?

- না, কিছুই জিজ্ঞাসা করেননি।

যাকগে, ও না আসাই ভাল। হ্যাঁ, শোন, তোকে একটা খবর দিতে ভুলে গেছি।

কি খবর মা?

- কাল রাতে ছেলের বাপ টেলিফোন করে তোর আব্বাকে জানিয়েছেন ছেলে বিশেষ কাজে আজ আবার লন্ডন রওনা হয়ে গেছে, ফিরতে পনর/বিশ দিন দেরি হবে। তাই বিয়ের তারিখ আরো এক মাস পিছিয়ে দিতে বলেছেন।

- সত্যি! আলহামদুলিল্লাহ।

কিন্তু এক মাস পরে তো হবেই।

- এক মাস অনেক লম্বা মা। এর মধ্যে কত কি ঘটে যেতে পারে। যাক বাবা হাফ ছেড়ে বাঁচা গেল। তারা আবার ফিরে এলো ক্যাবিনে।

[এগার]

পারভীনসহ দশজন যুবক-যুবতী প্রমোদ ভ্রমণে বের হয়ে ঢাকা থেকে চিটাগাং গিয়ে যাত্রা বিরতি করে। পরের দিন সকালে আবার যাত্রা করার মানসে তারা একটি হোটেলে গিয়ে ওঠে। রাত্রির আহারাদি শেষে এক যুবক বলল, এর আগে আমি কক্সবাজার গিয়েছিলাম– সেখানকার হোটেলগুলো অধিকাংশ ডবল বেডের। সিঙ্গেল বা থ্রি-ফোর বেড খুব সীমিত। দ্বিতীয় কথা হলো, ওখানকার পুলিশ স্বামী-স্ত্রী ছাড়া হোটেলে রাত্রি যাপনের উপর কড়াকড়ি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে থাকে। তাহলে আমরা কিভাবে কোথায় উঠব? শুনে শহীদুল বলল, নো প্রবলেম। আমরা স্বামী-স্ত্রী হয়ে যাব। শহীদুলের কথায় সব যুবক একমত হলেও দু'জন মেয়ে অমত পোষণ করল। কিন্তু পারভীন ও শিরিন তাদের বুঝাল এতে অমতের কি আছে? সত্যি সত্যি তো আর স্বামী-স্ত্রী হয়ে যাবেনা। বরং এতে এক নতুন রোমাঞ্চের সৃষ্টি হবে। আর প্রমোদ ভ্রমণে এসে যদি রোমাঞ্চের সৃষ্টি না হলো তাহলে আর ভ্রমণের স্বার্থকতা কোথায় রইল? ভালই হবে, দুধের স্বাদ ঘোলে মিটানোর অভিজ্ঞতা বাড়বে। আর একজন বলে উঠল, আরে এটা হলো সম অধিকারের যুগ। এ যুগে যত ফ্রী স্টাইলে চলতে পারবে পরীক্ষায় তত বেশী নম্বর পাবে। শিরিন বলল, ঠিকই তো মৌলবাদী সংকীর্ণ মন নিয়ে চলতে চাইলে প্রগতি মুখ থুবড়ে পড়বে। আরে মাটির দেহ তো একদিন মাটির সাথে মিশে বিলিন হয়ে যাবে, পোকা-মাকড় কুরে কুরে খাবে, তাকে রক্ষার জন্য অত চিন্তা-ভাবনা করে কি হবে? শিরিনের বক্তব্যে সকলেই হাত তালি দিয়ে বাহ্‌বা জানাল। পারভীন বলল, স্রষ্টাকে ধন্যবাদ যে, আমাদের মৌলবাদীদের ঘরে জন্ম দেননি। তাহলে কি আর জীবনকে এভাবে এনজয় করতে পারতাম? কখনি নয়? দুনিয়াটা মস্তবড়, খাও দাও ফুর্তি কর। এই বাস্তবধর্মী কবিকে সালাম করতে ইচ্ছে হচ্ছে বলল শহীদুল। পারভীন বলল, তাহলে কে কার স্ত্রী হবে আর কে কার স্বামী হবে এখান থেকে ঠিক করে রিহার্সাল দিতে দিতে যাওয়াই ভাল। একজন বলল, নিঁখুত অভিনয় করতে হলে স্টেজ রিহার্সাল তো দিতেই হবে। আর চরিত্র বন্টনের দায়িত্ব আমরা টিম লিডারের উপরই ছেড়ে দিচ্ছি। পারভীন বলল, ওটা ঠিক হবেনা– এখানে মনের মিল অমিলের প্রশ্ন আছে। তার চেয়ে যে যাকে পছন্দ করে সে তাকে বেছে নিক। শিরিন বলল–

ঠিক আছে, উদ্বোধনটা তুই করে দে। পারভীন বলল, তাহলে আমি শহীদুল ভাইকে সিলেকট করলাম। এরপর বাকিরা নিজ নিজ পছন্দ মত অস্থায়ী স্বামী নির্বাচন করে আধুনিক প্রজন্ম প্রগতিকে আর এক ধাপ এগিয়ে নিল।

পরের দিন চিটাগাং থেকে রওনা হয়ে ওরা কক্সবাজার পৌঁছে প্রথমেই গেল হোটেলে। একটি সুন্দর তিনতলা হোটেলে উঠে জোড়ায় জোড়ায় স্বামী-স্ত্রী হিসাবে খাতায় নাম লিখিয়ে যার যার রুমে গিয়ে ঢোকে। তারপর সকলেই গোসল করে রাস্তার ধুলাবালি থেকে মুক্ত হয়ে ঐদিন আর কোথায়ও না বেরিয়ে বিশ্রাম নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। পরের দিন সকালে চা-নাস্তা সেরে ওরা বের হলো শহর ঘুরতে। চষে বেড়াল সারা শহর। ওদের চাল-চলন কথাবার্তা বিশেষ করে পাঁচ জোড়া স্বামী-স্ত্রী সকলে প্রায় একই বয়সের হওয়ায় এবং ওদের কারো কোন সন্তানাদি হয়েছে বলে শরীরে বা চেহারায় তেমন কোন চিহ্ন না থাকায় স্থানীয় অনেকের মনেই সন্দেহের উদ্রেক করে। এ ব্যাপারে স্থানীয় দু'জন যুবক হোটেলে গিয়ে ম্যানেজারকে জানাতেই ম্যানেজার ভয় পেয়ে গেল। কারণ কিছুদিন আগে এমন একটি নকল দম্পতি ধরা পড়ায় অসামাজিক কাজের সহযোগিতার অজুহাতে পুলিশ তার কাছ থেকে মোটা টাকা হাতিয়ে নেয়। তাই ম্যানেজার নিজের দায়িত্ব এড়াবার জন্য থানার ওসি সাহেবকে ব্যাপারটা জানিয়ে রাখল।

এ দিকে পারভীন তার দলবল নিয়ে সারাদিন ঘুরাঘুরি করে বিকালে হোটেলে ফিরে সবাই মিলে পরামর্শ করল,আজ আর বের হবে না, আগামী- কাল সাগর সৈকতে যাবে। ওরা সাগরে সাঁতার কাটার জন্য কিছু সংক্ষিপ্ত পোশাকও কিনে এনেছে, কারণ শাড়ী ব্লাউজ বা সালোয়ার-কামিজ পরে তো আর জলকেলী করা যাবেনা। ফ্রী স্টাইলে আনন্দ স্নান করতে দরকার টাইট ফিটিংস ড্রেস। যে ড্রেস থাকবে শরীরের সাথে মিশে, বোঝাই যাবে না শরীরে কোন বস্ত্র আছে। সিনেমা, টিভিতে পাশ্চাত্য সভ্যতার নমুনাতো ওরা কম দেখে নাই। সেই সাথে ডিশ এ্যান্টিনার বদৌলতে যেটুকু বাকি ছিল সেটুকু উন্মুক্ত করে দেখিয়ে দিয়েছে আধুনিক সভ্যতার মনমুগ্ধকর রূপ। তাই সমগোত্রীয়দের সব দৃশ্যই তো ওরা মজ্যাগত করে নিয়েছে। রাতে হোটেলে নতুন কেনা পোশাকগুলো সকলেই দেহে চাপিয়ে ট্রায়াল দিয়ে দেখে নিল একবার করে। ঢাকায় তো এসব পোশাক পরে লেকে বা নদীতে গোসল করার উপায় নেই। মৌলবাদীরা দেখলে কি আর রক্ষা আছে– তুলকালাম কান্ড বাঁধিয়ে বসবে না? কবে যে

এদেশ মৌলবাদী মুক্ত হবে আর কবে যে ওরা ফ্রী স্টাইলে ঘুরে ফিরে বেড়াতে পারবে এটাই এখন ওদের দুঃশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পোশাকগুলো ট্রায়াল দেওয়ার সময় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সকলেই নিজেদের দেহ সৌন্দর্য দেখে অবাক হচ্ছিল এবং গর্বে এক একজনের বক্ষ ফুলে উঠছিল। কিন্তু দুঃখ করতে লাগল এই অপূর্ব সৌন্দর্য বস্ত্রের আবরণে আড়াল করে বেড়াবার জন্য। সুন্দর বস্তু যদি প্রদর্শিতই না হলো তাহলে সে সুন্দর সৃষ্টির স্বার্থকতা কোথায়? এ ট্রায়াল চলছিল মেয়ে মহলে। পাঁচজন মেয়ে এক রুমে একত্র হয়ে ট্রায়াল দিচ্ছিল। কথার পৃষ্টে একজন বলে উঠল তার চেয়ে বল, ফুলে যদি ভ্রমর বসে মধু সংগ্রহ না করল তাহলে সে ফুল ফুটে লাভ কি? এ কথায় সকলেই হিঃহিঃ করে হেসে উঠল। হাসি থামলে শিরিন বলল, ইউরোপ, আমেরিকায় তোদের জন্ম হওয়া উচিত ছিল। নাহার নামের মেয়েটি বলল, শুনেছি সে দেশের মায়েরা বয়স্ক মেয়ে বাইরে বের হবার আগে জন্ম নিয়ন্ত্রণ বড়ি গুলিয়ে মেয়েকে এক গ্লাস দুধ খাইয়ে দেয়। যদি কোন মেয়ে দুধ না খেয়ে বাইরে যায় তাহলে ওদেশের মায়েরা খুব দুঃশ্চিন্তায় থাকে। শুনে পারভীন বলল, এমন মাদের গর্ভে যারা জন্মেছে তারা সত্যি ভাগ্যবান, তাদের জীবন স্বার্থক। বাংলাদেশের হ্যাংলা মায়েরা মেয়েকে দুধ খাওয়াবে কি, তারা তো মেয়েদের বাইরে যাবার কথা শুনলেই সাপ দেখার মত চমকে ওঠে। তারপর বিয়ে নামের মন্ত্র পাঠ করার পর স্বামী দেবতা যদি আমার মত হয় তাহলে তো জীবনটাই বরবাদ। নাহার বলল, তাইতো মায়ের নিষেধ অমান্য করে চলে এলাম। বিয়ে হলে তো আর এ সুযোগ জুটবে না। বিউটি বলল, আমি মোটেও ছেলেদের বিশ্বাস করিনা। ওরা বিয়ের আগে কত মিষ্টিমিষ্টি কথা বলে, হাত ধরাধরি করে পার্কে, লেকে ঘুরে বেড়িয়ে নিজেকে গ্রগতিবাদী বলে প্রকাশ করে। তারপর যদি দু'জনার বিয়েটা কোনমতে হয়ে যায়, তখন আর প্রগতিবাদের চেহারা থাকেনা। তখন মৌলবাদী হয়ে পারলে বৌকে সিন্দুকে ভরে রাখে। কোন পুরুষ বন্ধুর সাথে কথা বললেই সাহেবের মেজাজ সপ্তমে ওঠে। আসলে এই হীনমন্যতা থাকা উচিত নয়। আবেদন নিবেদনের অধিকার সকলেরই থাকা উচিত। নাহার বিউটির কথায় সায় দিয়ে বলল, তুই ঠিক বলেছিস। এই পারভীনের কথাই ধরনা, বিয়ের আগে ওর স্বামী কত ফ্রী স্টাইলে ওকে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। অথচ বিয়ের পর কত পরিবর্তন। স্বামীর কথা উঠায় পারভীনের মনে পড়ে যায় রকিব অ্যাক্সিডেন্ট করে মেডিকেলের বিছানায় শুয়ে

আছে। ক্ষণিকের জন্য ওর বুকটা মোচড় দিয়ে ওঠে। এমন সময় নাহার তার সাঁতারের সংক্ষিপ্ত ড্রেসটি পরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বলে ওঠে না ভাই আমি এ ড্রেস পরতে পারবনা। এই দেখ, কি টাইট হয়ে শরীরের সাথে লেপ্টে আছে। শিরিন তা দেখে বলল– তাতে কি হয়েছে, তোর শরীরে মাংস একটু বেশী তাই একটু টাইট মনে হচ্ছে, সাঁতার কাটতে সুবিধা হবে।

কিন্তু সাগর সৈকতে কত লোক থাকবে। তাদের সামনে লজ্জা করবেনা? শিরিন বলল, লজ্জা? ওটাতো মৌলবাদীদের আরবী অভিধানের শব্দ। আধুনিক প্রগতিবাদে লজ্জা বলে কোন শব্দ নেই। লজ্জাকে জয় করার নামই হলো আধুনিকতা। পাশ্চাত্য দেশগুলোর সিনেমায় দেখিসনি সে দেশের মেয়েরা কত ফ্রী! তোর তো শরীরে তাও কিছু আবরণ থাকবে, ওদের তো তাও থাকেনা। সম্পূর্ণ ফ্রী স্টাইলে হাজার হাজার লোকের সামনে তারা সুইমিংপুলে অথবা নদীতে নারী-পুরুষ একত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। ওরাইতো আধুনিক সভ্যতার জন্মদাতা। শিরিনের বক্তব্য শুনে সকলেই আর একবার হাত তালি দিয়ে বাহবা জানাল। এরপর সব দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে সকলেই নিজ নিজ রুমে চলে গেল। রাতের আহারাদি সেরে গল্পগুজব করতে ওদের রাত এগারটা বেজে যায়। শুতে যাবার আগে হোটেল বয় বিল নিয়ে এলে ওরা বিল মিটিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ে।

রাত বারটার সময় ওদের পাঁচটি রুমের কড়া এক সঙ্গে নড়ে ওঠে। দরজা খুলে দেখে প্রতি রুমের দরজার সামনে দু'জন করে পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। তাদের জানানো হলো নীচে অফিস রুমে ওসি সাহেব বসে আছেন, আপনারা যারা পুরুষ আছেন তারা আমাদের সাথে অফিস রুমে চলুন। ব্যাপার কিছু বুঝতে না পেরে অগত্য সবাইকে নীচে নেমে আসতে হলো। ওসি সাহেব ওদের পাঁচজনকে পাঁচটি চেয়ারে বসতে বলে ম্যানেজার সাহেবের কাছে রেজিস্টার বই চাইলেন। তারপর রেজিস্টার বই দেখে একে একে প্রত্যেককে তাদের নাম, পিতার নাম ও স্ত্রীদের নাম জিজ্ঞাসা করে নোট করতে লাগলেন এবং সাথে স্ত্রীদের পিতার নামও নোট করলেন। কিন্তু পাতানো স্বামীরা স্ত্রীদের সঠিক নাম বলতে পারল না। কারণ ডাক নামেই সবাই পরিচিত। আসল আর একটা ভাল নাম ডাক নামের নীচে চাপা পড়ে আছে তাতো কারো জানা নেই। তাই যে যেভাবে পারল নাম বলে গেল। যেমন নাহারের সাথে লাগা নুরুন্নাহার, শিরিনের সাথে যোগ করল শিরিন আখতার ইত্যাদি। ওসি সাহেব তাদের নাম

ঠিকানা লিখে নিয়ে পাশের একটা রুম দেখিয়ে বললেন, আপনারা ঐ রুমে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন। শহীদুল বলল, স্যার আমরা আমাদের রুমে যাই? ওসি সাহেব বললেন, যাবেন তবে এখন নয় পরে। ওদের পাঁচজনকে পাশের রুমে পাঠিয়ে দিয়ে ওসি সাহেব দু'জন সিপাইকে নিযুক্ত করলেন তাদের পাহারায়। তারপর অন্য সিপাইদের পাঠালেন মেয়েদের নিয়ে আসতে। একই সাইজের পাঁচটি মেয়ে এসে যখন ওসি সাহেবের সামনে দাঁড়াল ওসি সাহেব তাদের দেখে মৃদ হেসে বসতে বলে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনাদের সকলের বিয়েই বোধ হয় একই সঙ্গে হয়েছে? পারভীন জবাব দিল না, বিভিন্ন সময়ে হয়েছে।

আপনারা কি হানিমুনে এসেছেন? জিজ্ঞাসা করলেন ওসি সাহেব।

- না, আমরা ভ্রমণে এসেছি।

আপনার নাম কি? পুরা নাম বলবেন।

- জোবেদা খানম ওরফে পারভীন।

আপনার স্বামীর নাম?

- রকিব আহমেদ।

কি করেন তিনি?

এডভোকেট! কথাটা হঠাৎ বলে ফেলেই পারভীন বুঝতে পারল ঝোকের মাথায় সে সর্বনাশ করে ফেলেছে। সত্যকে মিথ্যা দিয়ে ঢাকতে চাইলে এভাবেই বুঝি সত্য বেরিয়ে আসে। পারভীনের মনে শংকার সৃষ্টি হলো। তবু সে বাইরে স্বাভাবিক ভাব বজায় রেখে দাঁড়িয়ে রইল। ওসি সাহেব পূর্বে ছেলেদের কাছ থেকে দেয়া নোট বের করে বললেন, আপনার স্বামী তো তার নাম শহীদুল ইসলাম বলেছেন, এবং হোটেল রেজিস্টারেও তাই লিখিয়েছেন এবং তিনি একজন ইঞ্জিনিয়ার বলে জানিয়েছেন।

সে ঠিকই বলেছে। তার আসল নাম রকিব আহমেদ, শহীদুল তার ডাক নাম। আর তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং ও এলএলবি দুটোই পাস করেছেন। পারভীনের কথা শুনে ওসি সাহেব আর কথা না বাড়িয়ে প্রয়োজনীয় নোট লিখতে শুরু করলেন। একে একে পাঁচজনের নোট লেখা শেষ করে ছেলেদের জবানবন্দীর সাথে মেয়েদের জবানবন্দী মিলিয়ে দেখলেন কারো সাথে কারো কথার মিল নেই। তিনি পরিষ্কার বুঝতে পারলেন এরা কেউ স্বামী-স্ত্রী নয়, এরা সকলেই লিভ টুগেদারের আসামী। কিন্তু সে কথা তাদের বুঝতে না দিয়ে ছেলেদের বের

করে এনে বললেন, আপনাদের থানায় যেতে হবে, চলুন। ছেলেদের তরফ থেকে কেউ কেউ প্রতিবাদ করলেও সে প্রতিবাদে কোন কাজ হলো না, প্রগতির মানসকন্যা ও মানসপুত্রদের মুখ শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। রওনা হবার আগে ওসি সাহেব হোটেল ম্যানেজারকে বলে গেলেন, রুমগুলো রাতের মত বন্ধ করে রাখুন। কাল দিনে পরবর্তী নির্দেশ জানানো হবে।

পরের দিন বাতাসের সাথে খবর ছড়িয়ে পড়ল ঢাকা থেকে দশজন যুবক-যুবতী লিভ টুগেদার করতে এসে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। মজাদার এ খবর শুনে দলে দলে লোক ছুটল থানার দিকে। বিভিন্ন পত্রিকার সাংবাদিকরা কৃত্রিম স্বামী-স্ত্রীকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে গ্রুপ ফটো তুলে পাঠাল পত্রিকায়। থানা থেকে আসামীদের পাঠানো হলো মহকুমা হাকিমের কোর্টে। মহকুমা হাকিম সব শুনে ঢাকা রমনা থানার উপর তদন্ত ভার দিয়ে সকলকেই জেল হাজতে পাঠিয়ে দিলেন। প্রগতির যে সমস্ত মানসকন্যারা কয়েক ঘন্টা আগেও লজ্জা শরম মৌলবাদীদের একচেটিয়া সম্পদ, আধুনিক প্রগতিবাদের অভিধানে লজ্জা-শরম বলে কোন শব্দ নেই বলে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করেছিল সেই লজ্জা শরমই আজ তাদের গ্রাস করে ফেলল। আজ তাদের কাছে এ লজ্জাকর ব্যাপারের চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়ঃ মনে হতে লাগল।

[বার]

রকিবের দুর্ঘটনার আজ চার দিন। এখন সে অনেক সুস্থ। ডাক্তার বলেছে আরো কয়েকদিন থাকতে হবে হাসপাতালে। সেলাই না খোলা পর্যন্ত রিলিজের তারিখ বলা যাবে না। শামীমা সব সময়ই রকিবের কাছে থাকে। রাতে শাহিদা আসে, সকালে শাহিনা বেগম অথবা হাসান এলে শামীমা ও শাহিদা বাসায় চলে যায়। দুপুরে গোসল করে জোহরের নামাজ আদায় করে নিজের ও স্বামীর খাবার নিয়ে চলে আসে হাসপাতালে। স্বামীকে হাতে তুলে খাওয়ায় ও নিজে খায়। সাহিদা আসে রাতে খাবার নিয়ে। দুপুরে শামীমা এলে শাহিনা বেগম বাসায় চলে যান। খান বাহাদুর সাহেব প্রথমে হাসপাতালে আসতে রাজি হন নাই। পরে স্ত্রীর অনুরোধে দু'দিন এসেছেন। পিতাকে দেখে রকিব আবেগে কেঁদে ফেলে। সে পিতার হাত ধরে ক্ষমা চেয়ে

বলে, আব্বা আমার অপরাধ ক্ষমাহীন। ক্ষমা চাইবার অধিকারও আমি হারিয়ে ফেলেছি। ছেলের আবেগপূর্ণ কথায় খান বাহাদুরের হৃদয়ে স্নেহের জোয়ার উথলে ওঠে। তিনিও আর ঠিক থাকতে পারেন না, অশ্রুতে তারও দাঁড়ি ভিজতে থাকে। তিনি পরে অশ্রু সংবরণ করে বলেন, ভুল বুঝে ভুল শুধরাবার নামই তওবা। তওবা আল্লাহর কাছে খুব প্রিয়। তুমি যদি নিজের ভুল বুঝতে পেরে থাক তাহলে আনুষ্ঠানিক ক্ষমা চাওয়ার দরকার হবে না। তবে জেনে রেখ তোমাকে মাফ করলেও বাড়িতে অশান্তি আমি প্রশ্রয় দিবনা।
জান্নাতের পরিবেশকে আমি জাহান্নাম করে তুলব না। তুমি আগে সুস্থ হও, পরে ভেবে-চিনতে আমাকে জানিও। রকিব সেদিন পিতার কথার কোন জবাবই দিতে পারেনি, শুধু নীরবে সব শুনে গেছে।
আজ বিকাল বেলা শামীমা স্বামীকে হরলিক্স তৈরি করে খাইয়ে দিয়ে উঠতেই রকিবের মুহুরী সাহেব এসে ক্যাবিনে ঢুকলেন। সে রকিবের পাশে এগিয়ে আসতেই শামীমা বেলকনিতে গিয়ে দাঁড়াল। মুহুরী সাহেব পাশে বসে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করার পর পকেট থেকে একখানা জাতীয় দৈনিক পত্রিকা বের করে একটি বিশেষ খবর শিরোনাম চিহ্নিত করে রকিবের হাতে দিল। খবরের শিরোনাম ছিল, 'কক্সবাজার হোটেল গুলশানে পুলিশি অভিযান', অসামাজিক কাজে লিপ্ত সন্দেহে দশ যুবক-যুবতী গ্রেফতার। শিরোনামের নীচেই দশ জনের রঙিন ফটো ছাপা হয়েছে। রকিব ফটোগুলোর প্রতি নজর দিতেই পারভীনকে সেখানে দেখে চক্ষু বন্ধ করে কাগজখানা মুহুরী সাহেবের হাতে ফেরৎ দিল। তারপর বেশ কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ রাখার পর চক্ষু খুলে মুহুরী সাহেবকে বলল, কাগজখানা সেরেস্তায় যত্ন করে রেখে দিবেন। আর এ সম্বন্ধে এখানে কিছু আলাপ করবেন না। মুহুরী সাহেব কাগজখানা ভাঁজ করে পকেটে রেখে উঠে গেলেন। রকিব লজ্জা-শরমে-মরমে মরে যেতে লাগল! ছিঃ ছিঃ না জানি সংবাদটা কিভাবে রসিয়ে রসিয়ে পরিবেশন করেছে। আব্বা যদি এ সংবাদ পাঠ করে থাকেন– রকিব আর ভাবতে পারে না। সে চোখ খুলে শামীমার দিকে তাকাতেও লজ্জা পায়। ভাবে শামীমা যদি শোনে, তাকে যদি কেউ পত্রিকাটা দেখায় তাহলে আমাকে সে কোন দৃষ্টিতে দেখবে! রকিব মনে মনে বলতে থাকে– ইয়া আল্লাহ– আমার বাড়ির কারো নজরে যেন খবরটা না পড়ে। ছিঃ ছিঃ এর চেয়ে মৃত্যুও ভাল। আজ রকিবের পুরাপুরি উপলব্ধিতে

আসে ইসলামের বিধি-বিধান কত নিখুঁত, কত বাস্তবসম্মত। শামীমার সাথে পারভীনের তুলনা করতে গিয়ে রকিবের চোখ ফেটে পানি আসে। রকিবের মনে হয় শামীমার অপমান ও অবজ্ঞার শাস্তি আল্লাহ নিজ হাতে দান করেছেন, তিনি যে ন্যায় বিচারক। তাঁর বিধান অমান্যকারীকে তিনি এভাবেই অপদস্থ করে থাকেন। রকিব আরো ভাবতে লাগল, যাদের ছবি পত্রিকায় ছাপা হয়েছে তাদের বাপ-মা, আত্মীয়-স্বজন কিভাবে মানুষের কাছে মুখ দেখাবে? আর যারা ধরা পড়েছে তারাইবা ফিরে এসে কিভাবে সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে? পারভীন স্বামীকে মরণ বিছানায় রেখে বন্ধু-বান্ধবের সাথে প্রমোদ ভ্রমণে যেতে পারল? কোন সভ্য সমাজের কোন বিবেকবান স্ত্রী কি তা পারত? ঐ পারভীনের মোহে পড়ে আমিও তো শামীমাকে ত্যাগ করে এসে পারভীনকে নিয়ে ঘর বেঁধেছি। কিন্তু শামীমা সব অপমান, সব কষ্ট ভুলে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে আমার কাছে পড়ে আছে। একই কলেমা পাঠ করেই তো দু'জনকে বিয়ে করেছিলাম। অথচ দু'জনের প্রভেদ আকাশ আর জমিন। একজন আদর্শের প্রতীক আর একজন নর্দমার কীট। একজন স্নেহ-মমতাময়ী নারীকুলের গৌরব আর একজন নারী নামের কলংক। এখন বুঝতে পারছি উচ্চ শিক্ষা মানুষকে মনুষত্ব দান করে সভ্য বানাতে পারে না, যদি না ধর্মীয় শিক্ষা তার মধ্যে প্রবেশ করতে না পারে। রকিব চোখ বন্ধ করে এইসব ভেবে চলেছিল, আর নিজেকে অপরাধীর চরম সীমায় দেখতে পাচ্ছিল। এ অপরাধ তার নিজের হাতের সৃষ্টি। এ অপরাধের মন্ত্রনা দাতা শয়তান। শয়তানের কুৎসিত চেহারা তার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল, যে চেহারা একদিন তাকে মুগ্ধ করে ঘর থেকে বাইরে টেনে এনেছিল।

মুহুরী সাহেব চলে যাবার পর শামীমা রকিবের বিছানার পাশে এসে দেখে স্বামী তার চোখ বন্ধ করে আছে। তাই তাকে আর বিরক্ত না করে আবার বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। বেলকনির র‍্যালিং-এ হাত রেখে দূরে দৃষ্টি প্রসারিত করে শামীমা ভাবছিল, চারদিন পার হয়ে গেল তবু কেন তার দ্বিতীয় পক্ষ এলো না? নাকি এসে দূর থেকে আমাকে দেখে দেখে ফিরে যাচ্ছে? তাই যদি হয়ে থাকে তাহলে আমার কি অন্যায় হয়েছে? আমি কি তাহলে তার স্বামীর খেদমত থেকেও বঞ্চিত করছি? স্বামী কি এর জন্য আমার প্রতি নাখোশ? তাই কি বেশি কথাবার্তা বলছেন না? কিন্তু আমি তো কোন বাঁধার সৃষ্টি করিনি। (আর বাঁধার

সৃষ্টি করলেই বা সে বাধা অতিক্রম করে স্বামীর পাশে থেকে স্বামীর সেবা করা) নারীর একমাত্র আশ্রয়স্থলই তো হলো তার স্বামী, ব্যাপারটা শামীমার কাছে রহস্যাবৃত বলেই মনে হলো। একবার ভাবল স্বামীকে একথা জিজ্ঞাসা করবে। আবার ভাবল অসুস্থ স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলে যদি তার মানসিক প্রশান্তির ব্যাঘাত ঘটে? যদি সে এমন কিছু বলে, যা শুনে তার নিজেরই খারাপ লাগবে। তাছাড়া স্বামী যখন আজ পর্যন্ত নিজে কিছু বলল না, তখন সেইবা কেন তার শত্রুর কথা খুঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করবে? তার চেয়ে যেমন চলছে তেমনি চলুক, অন্ততঃ যে কয়দিন হাসপাতালে আছে সে কয়দিন তো স্বামীর পাশে থেকে তার সেবা করার সুযোগ সে পাবে। রিলিজ হলে তো আর দেখা হবে না, স্বামী তার নতুন সংসারে চলে যাবে। আব্বা যে ইংগীত দিয়েছেন তাতে ঐ বৌকে আব্বা বাড়িতে তুলবেন না, আর তিনিও বৌকে ছাড়তে পারবেন না। কিন্তু রিলিজ হবার পর যখন স্বামী তার নতুন স্ত্রীর হাত ধরে সামনে দিয়ে চলে যাবেন তখন সে দৃশ্য কি আমি সহ্য করতে পারব? না, আমি তা সহ্য করতে পারব না। তার চেয়ে স্বামীর রোগ মুক্তির জন্য যে দু'টি নফল রোজা মানত করেছি সেই রোজা রেখে বাড়িতেই থাকব হাসপাতালে আসবই না। শামীমা যখন এইসব চিন্তায় ছিল আচ্ছন্ন তখনি রকিবের কণ্ঠ তার কানে পৌঁছল, সে দৌড়ে স্বামীর সামনে গিয়ে দাঁড়াল। রকিব বলল, একটু পানি দাও। শামীমা পানি এনে রকিবকে খাইয়ে গ্লাস রেখে একটি কমলা হাতে নিয়ে রকিবের পাশে এসে বসল এবং কমলা ছিলে কোয়া বের করে স্বামীর মুখে দিতে লাগল। আর রকিব শামীমার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে খেতে লাগল। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর রকিব বলল, শামীমা তুমি সত্যি সুন্দরী।

- কে বলল আমি সুন্দরী? যে নারী তার স্বামীকে ধরে রাখতে পারে না সে নারী সবচেয়ে কুৎসিত নারী।

- এ তোমার অভিমানের কথা। মানুষের চেয়ে শয়তান বেশি শক্তিশালী। কোন দুর্বল নারী যদি সেই শক্তিশালী শয়তানের সাথে জিহাদে পরাজয় বরণ করে তাতে তার ব্যর্থতা প্রমাণ হয় না। সে যে প্রতিরোধে অবতীর্ণ হতে পেরেছে এটাই তার স্বার্থকতা।

- যে স্বার্থকতা বেদনা বয়ে আনে সে স্বার্থকতায় লাভ কি?

সে বেদনার যখন উপশম হয় তখন ঐ বেদনাই যে আনন্দ বয়ে আনে?

তোমার এ ত্যাগের বেদনারও উপশম একদিন হবে। আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ভালবাসেন। যারা শয়তানের কুমন্ত্রণায় ধৈর্যহারা হয় তাদের ভাগ্যেই নেমে আসে দুর্ভোগ। নিয়তিকে তো মেনে নিতেই হবে। রকিবের কথায় শামীমা মনে মনে ক্ষুব্ধ হলো। শামীমা বুঝতে পারল রকিব তার এই বিয়েকে নিয়তি বলে মেনে নিতে বলছে। তাই সে বলল, নিয়তিকে মেনে নিতে পেরেছি বলেই তো আজ তোমার সেবা করার সুযোগ পেয়েছি।

- আর তাইতো তোমার মহত্ত্ব ফুটে উঠেছে।

শামীমা মনে মনে বলল, এমন মহত্ত্বর আমার দরকার নেই। কর্তব্যের তাগিদেই আমাকে এখানে টেনে এনেছে! মহত্ত্ব কুড়াবার জন্য নয়। সে রকিবকে জিজ্ঞাসা করল, তোমার রিলিজ কবে হবে?

- কেন? রকিব জিজ্ঞাসা করল।

- ঐ দিন আমি আসব না।

- তুমি আসবে না? তুমি না এলে আমাকে নিয়ে যাবে কে?

তোমাকে নিয়ে যাবার লোক ঠিকই আসবেন। বরং আমি থাকলে তার আসতে অসুবিধা হবে।

তুমি ছাড়া আমাকে নিয়ে যেতে আর কেউ আসবে না শামীমা। শয়তানের ধোঁকায় পড়ে আমি হীরা ছেড়ে কাঁচ কুড়িয়ে যে পাপ করেছিলাম তার প্রায়শ্চিত্ত আমার হয়ে গেছে। আমি এখন শাপ মুক্ত। তুমি আমাকে ক্ষমা....

ওগো, ও কথা বলোনা। স্ত্রী কখনো স্বামীকে অপরাধী ভেবে ক্ষমা করে না, স্ত্রী সব সময়ই ক্ষমা প্রার্থী। রকিবের মুখে হাত চাপা দিয়ে বলল শামীমা। রকিব হাত বাড়িয়ে শামীমাকে নিজের বুকের উপর টেনে নিল। শামীমা স্বামীর বুকে মাথা রেখে আনন্দ অশ্রুতে স্বামীর বুক ভাসিয়ে চলল।

পরের দিন মুহুরী সাহেব আসলে রকিব তাকে বলল, বাসায় আমার যে জামা-কাপড় আছে সেগুলো ব্রীফ কেসে ভরে চেম্বারে এনে রাখবে এবং ঘর বন্ধ করে চাবি বাড়িওয়ালাকে বুঝে দিয়ে বলবে রকিব সাহেব ঘর ছেড়ে দিয়েছেন। ঐ ঘর আপনার ছেলে ও ছেলের বৌকে এনে তাদের দিতে বলেছে। রকিবের কথা শুনে মুহুরী সাহেবের ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে উঠল, তিনি খুশী হয়ে নির্দেশ পালন করতে বের হয়ে গেলেন।

[তের]

রকিব হাসপাতাল থেকে বাড়িতে আসার পনের দিন হয়ে গেছে। ডাক্তারের চিকিৎসা ও শামীমার সেবা-যত্নে সে এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। আগের মতই আবার কোর্টে যেতে শুরু করেছে। তবে এখন আর নিজে গাড়ী চালায় না, হাসান তাকে পৌঁছে দিয়ে আসে এবং নিয়ে আসে। রকিব প্রথম দিনই কোর্টে গিয়ে হাসানকে সাথে নিয়ে কাজী অফিসে যায় এবং কাবিন নামায় লিখিত মতে দাম্পত্য শর্ত ভঙ্গ করে উচ্ছৃঙ্খল জীবন-যাপনের অজুহাতে পারভীনকে ডিভোর্স করে ডিভোর্সনামা পারভীনের পিতার ঠিকানায় পাঠিয়ে দেয়। খান বাহাদুরের বাড়িতে আবার পূর্বের শান্তি ফিরে আসে। কিন্তু শাহিদার মনে কালো মেঘের ঝড় বয়ে চলে। ছেলের বাপ যে সময় পিছিয়ে দিন ধার্য করেছেন তার সময়ও প্রায় শেষ হয়ে আসছে। খান বাহাদুর এখনো তার প্রতিজ্ঞায় অটল। শাহিদাও এ বিয়েতে কিছুতেই রাজি হবে না মর্মে বাড়ির সকলকে জানিয়ে দিয়েছে। তবে এ কথা খান বাহাদুরকে বলতে কেউ সাহস করেনি। আজ দু'দিন থেকে শাহিদা খাওয়া-দাওয়া প্রায় ছেড়ে দিয়েছে। দিন-রাত ঘরে বসে কান্নায় বুক ভাসিয়ে চলেছে। শাহিনা বেগম ও শামীমা শাহিদার ব্যাপারে শংকিত হয়ে পড়েছে। কারো কোন কথাই সে শুনছে না। শাহিনা বেগম আজ দুপুরে শাহিদার ঘরে ঢুকে দেখলেন শাহিদা নিশ্চুপ জানালার পাশে বসে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তিনি ধীরে ধীরে মেয়ের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর ডাকলেন, মা শাহিদা, চল মা খেতে চল। কাল থেকে একেবারেই কিছু মুখে দিচ্ছিস না, এতে যে শরীরটা ভেঙে পড়বে। আয়নায় চেহারাটা দেখেছিস একবার?

- আঃ মা, আমাকে একটু একা থাকতে দাও তো, আর জ্বালাতন করো না।

- একা কেন থাকবি মা? কি তোর এত দুঃখ?

আমার দুঃখ তোমরা বুঝবে না মা। তোমরা যাকে মাথার তাজ মনে করছ, আমার কাছে সে মাংস লোলুপ পশুমাত্র। তোমরা যাকে জান্নাত মনে করছ আমার কাছে তা জাহান্নাম। আমার দুঃখ তোমাদের কঠিন হৃদয় স্পর্শ করবে না মা।

তওবা, তওবা। অমন কথা বলতে নেই মা, আল্লাহ নারাজ হবেন। বাপ কি কখনো তার সন্তানের অমঙ্গল চায় মা?

মা, আল্লাহ তোমাদের মত অবুঝ নন। তিনি দেখেন মানুষের মন, মানুষের ঈমান, আর তোমরা দেখ ধন-দৌলত, শান-শওকত।

তোকে বুঝাবার সাধ্য আমার নেই মা।

যারা নিজেরা অবুঝ, যারা সোনা ছেড়ে পিতলের দিকে হাত বাড়ায় তারা অন্যকে কি বুঝাবে মা? যদি পার আমার একটা উপকার কর, এক শিশি বিষ এনে দাও, আমিও বাঁচি তোমরাও বাঁচ।

- শাহিদা। এমন কথা বলিসনে মা। আমি তোর মা, আমাকে আঘাত দিয়ে কি লাভ তোর? আমিও যে তোরই মত অসহায় এক নারী। উঃ খোদা! আমি আর সইতে পারি না। শাহিনা বেগম কান্না জড়িত কণ্ঠে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। রাতে শামীমা অনেক তোয়াজের পর শাহিদাকে সামান্য আহার করাতে সক্ষম হলো। তারপর বিছানায় গিয়ে রকিবকে সমস্ত কথা খুলে বলল সে। রকিব সব শুনে চিন্তিত কণ্ঠে বলল, আব্বা যদি তার কোন বন্ধুকে কথা দিয়ে থাকেন তাহলে তাকে ফেরানো হবে কঠিন ব্যাপার। একমাত্র রাস্তা ছেলেকে সব কথা খোলাখুলি বলে তাকে এ বিয়ে থেকে নিবৃত করা, এছাড়া অন্য কোন পথ দেখছি না।

কিন্তু ছেলে যদি রাজি না হয়? শামীমা প্রশ্ন করে।

- ছেলে যদি ভদ্র ও বিবেকবান হয় তাহলে সে ব্যাপারটা বুঝবে। তুমি ছেলের নামটা ও ঠিকানা আমাকে বলো। আমি হাসানকে সাথে নিয়ে কাল একবার তার সাথে দেখা করব।

তাই কর, শাহিদার দুঃখ আমিও আর সইতে পারছি না। শোন, ছেলের বাপের নাম হাজী শরিফুল ইসলাম, ছেলের নাম আরিফুল ইসলাম, বাসা ধানমন্ডি চৌদ্দ নম্বর রোডে, ছেলে বিলেত দু'বছর ছিল। শামীমার কথা শুনে রকিব লাফ দিয়ে বিছানায় উঠে বলল, কি বললে? হাজী শরিফুল ইসলামের ছেলে আরিফুল ইসলাম? লন্ডনে ছিল?

- হ্যাঁ, কেন?

- সর্বনাশ। আব্বা হাত-পা বেঁধে শাহিদাকে সাগরে ভাসাতে যাচ্ছিলেন। সত্যি আল্লাহর কুদরতের খেলা বুঝার ক্ষমতা মানুষের নেই। এ বিয়ে যদি আমি বাড়ি

আসার আগে হয়ে যেত তাহলে শাহিদাকে সত্যি দুঃখের বোঝা মাথায় নিয়ে সারাটা জীবন কাটাতে হতো।

- ছেলের বাপ তারিখ না পিছালে গত দশ তারিখেই বিয়ে হয়ে যেত। কিন্তু কি হয়েছে ছেলের, তুমি তাকে চেন?

চিনি না, তবে সে আমার একটা মামলার আসামী।

আসামী! বল কি?

- হ্যাঁ, আমি ঠিকই বলছি। আরিফুল ইসলাম লন্ডনে থাকাকালিন সে ঐ দেশের এক মেয়েকে বিয়ে করে। মেয়েটি ছিল খৃষ্টান। বিয়ের আগে সে মুসলমান হয়ে আয়শা আখতার নাম ধারণ করে। বিয়ের পর ওরা স্বামী-স্ত্রী এক বছর সংসার করে। এতে মেয়েটি গর্ভবতী হয়ে পড়লে আরিফুল তাকে ছেড়ে চলে আসে বাংলাদেশে। এখানে এসে সে বিয়ের কথা চেপে যায়। মেয়েটি উচ্চ শিক্ষিত এবং ওখানকার একটি কলেজের প্রফেসর। আরিফুল চলে আসার পর মেয়েটি খোঁজ-খবর নিয়ে যখন জানতে পারে তার স্বামী তাকে ছেড়ে দেশে পাড়ি জমিয়েছে, তখন মেয়েটিও বাংলাদেশে চলে আসে।

- তারপর? জিজ্ঞাসা করে শামীমা।

তারপর মেয়েটি আরিফুলকে খুঁজে বের করে চলে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করে এবং তাকে ফিরে যেতে অনুরোধ করে। এতে আরিফুল ক্ষিপ্ত হয়ে বিয়ের কথা অস্বীকার করে তাকে তাড়িয়ে দেয়। পরে মেয়েটি নিরুপায় হয়ে দাম্পত্য স্বত্বের মামলা দায়ের করে, আর সে মামলার আরজি লিখেছি আমি।

- কি সর্বনাশ। শেষ পর্যন্ত বিয়েকেই অস্বীকার?

হ্যাঁ, অথচ মেয়েটির সাথে একাধিক ফটো ও কাবিননামা মেয়েটি কোর্টে দাখিল করেছে। মামলা দায়ের করেই মেয়েটি দেশে ফিরে যায়। তারপর আরিফুল যখন জানতে পারে তার নামে মামলা হয়েছে এবং যে ডকুমেন্ট মেয়েটি দাখিল করেছে তা অস্বীকার করার ক্ষমতা তার নেই, তখন আরিফুল সম্ভবত কোন একটা মিটমাট করার জন্যই সেও লন্ডন গেছে, তার কারণে ছেলের বাপ তারিখ পিছাতে বাধ্য হয়েছে। অতএব তুমি শাহিদাকে বলতে পার তার বিয়ে ওখানে হচ্ছে না।

খবরটা আব্বাকে জানানো দরকার।

সেতো জানাতেই হবে। তবে আজ না, কাল সকালে নাস্তার টেবিলে

পরিবেশন করা হবে সংবাদটা। কিন্তু এ বিয়ে ভেঙ্গে গেলেও আব্বা কি হাসানের সাথে শাহিদার বিয়ে দিতে রাজি হবেন?

সে পরে দেখা যাবে। তুমি থাক, আমি শাহিদাকে ও মাকে খবরটা এক্ষুনি বলে আসি। পরের দিন চায়ের টেবিলে খান বাহাদুর সাহেবকে খবরটা পরিবেশন করার কথা থাকলেও তা আর হয়ে ওঠেনি। রকিবের ঘুম থেকে উঠতে দেরি হওয়ায় খান বাহাদুর সাহেব আগেই নাস্তা করে নিয়েছেন, তাই সিদ্ধান্ত হলো- শামীমা, রকিব ও শাহিনা বেগম খান বাহাদুর সাহেবের ঘরে গিয়েই সংবাদটা পরিবেশন করবেন। সেই সাথে শামীমা হাসানের কথাটাও তুলবে। কিন্তু হাসানের কথা তোলার ব্যাপারে শাহিনা বেগম দ্বিমত পোষণ করে বললেন, এ খবর শোনার পর তার মন-মেজাজ বিগড়ে যাবে। তার উপর হাসানের কথা ঐ মুহূর্তে বললে উনি রেগে যেতে পারেন, আর তাতে হিতে বিপরীত হতে পারে।

শাহিনা বেগমের কথা শুনে শামীমা বলল, আপনি চিন্তা করবেন না মা, আমি পরিবেশ বুঝেই কথা বলব। আপনাদের কিছুই বলতে হবে না, ও দায়িত্বটা আমার উপরই ছেড়ে দেন। ওরা তিনজন খান বাহাদুরের ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলো। শাহিদা এসে বাইরে দরজার পাশে দাঁড়াল কান খাড়া করে। খান বাহাদুর সাহেব মা, ছেলে ও ছেলের বৌকে ঘরে ঢুকতে দেখে হেসে শামীমাকে বললেন, কিরে মা, অতর্কিত আক্রমণ– ব্যাপার কি? শামীমাও হেসে জবাব দিল। আপনার সাথে গল্প করতে এলাম আব্বা। ওরা তিনজন বসল। তারপর রকিবই কথা তুলে বিস্তারিত ঘটনা খান বাহাদুর সাহেবকে জানাল। খান বাহাদুর সাহেব চুপ করে সব ঘটনা শুনে নির্বাক হয়ে বসে রইলেন। ঘরটায় পীন পতন নীরবতা বিরাজ করতে লাগল। সকলেই অপেক্ষা করতে লাগল খান বাহাদুর সাহেবের প্রতিক্রিয়া কি হয় তা দেখার জন্য। ওদিকে আকস্মিক ঘটনায় খান বাহাদুর সাহেবকে ভাবিয়ে তুলল। তিনি এখন কি করবেন কিছুই স্থির করতে পারছিলেন না। বিয়ের আর মাত্র কয়েকদিন বাকি। অনেক বন্ধু-বান্ধবকে তিনি মৌখিক দাওয়াতও দিয়ে ফেলেছেন। এ অবস্থায় যদি বিয়ে না হয় এবং দাওয়াত ফিরিয়ে নিতে হয় তাহলে তার চেয়ে লজ্জার আর কি আছে? আবার রকিব যা বলল তাতে কোন মতেই এ বিয়ে হতে পারে না। খান বাহাদুর সাহেব চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠলেন। অনেকক্ষণ নীরব থাকার পর বললেন,

এখন আমি কি করব? আমার মান-সম্মান তার উপর মেয়েটার ভবিষ্যৎ। দিন তারিখ ঠিক হবার পর বিয়ে ভেঙে যাওয়া লোকে ভাল চোখে দেখে না, এখন এই মুহূর্তে আমি শাহিদার উপযুক্ত ছেলে কোথায় পাব?
খান বাহাদুর সাহেবকে এসময় খুবই অসহায় মনে হচ্ছিল। শামীমা এই সুযোগটা হারাল না। সে বলল, যে আল্লাহ বিয়ে ভেঙে দিয়েছেন সেই আল্লাহ আবার ছেলেও জুটিয়ে দেবেন, আপনি ও নিয়ে চিন্তা করবেন না আব্বা। রকিব বলল, এ বিয়ে না হয়ে ভেঙে যাওয়াই কি আমাদের জন্য মঙ্গলজনক হয়নি আব্বা? যদি এই ঘটনাগুলো বিয়ের আগে না হয়ে পরে প্রকাশ হতো তাহলে শাহিদার জীবনটাই যে বৃথা হয়ে যেত।
- কিন্তু মানুষ এত ধোকাবাজ হতে পারে কিভাবে?
ধোঁকাবাজীর ছবক তো মানুষই নিয়েছে। যে ছেলে একটি সরল মেয়ের ভালবাসার সুযোগ নিয়ে তার সর্বনাশ করে পালিয়ে আসতে পারে, সে শাহিদার জীবনেও যে অশনি সংকেত হয়ে দেখা দিত না তারই বা কি নিশ্চয়তা ছিল?
- কোন নিশ্চয়তা ছিল না। আমি বুঝতে পারছি, আমার ঐ মায়ের কথা না শুনে বিয়ের তারিখ ঠিক করার কারণেই আল্লাহ আমাকে এ শাস্তি দান করলেন। জবাবে শামীমা বলল, শাস্তি আবার আল্লাহ কোথায় দিলেন আব্বা? আল্লাহতো আপনাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করলেন।
- ইয়েস মাই ডটার। তুমি ঠিকই বলেছ, বিপদ থেকে উদ্ধারের একমাত্র মালিক তো পরম করুণাময় আল্লাহই। উঃ কি সর্বনাশ থেকেই না আল্লাহ বাঁচালেন। কিন্তু মেয়ের বিয়ের কথা প্রচার হবার পর সে বিয়ে না হওয়া ক্ষতিকর মা। মানুষকে তো সমাজ নিয়ে বাস করতে হয়।
- তা কিছুটা ক্ষতিকরতো বটেই। তবে আপনি যদি অনুমতি দেন আমি একটি ছেলের সন্ধান দিতে পারি। আর আপনি রাজি থাকলে আপনার ধার্য তারিখেই শাহিদার বিয়ে হওয়া সম্ভব। শামীমার কথা শুনে রকিব ও শাহিনা বেগমের বুক কেঁপে উঠল। খান বাহাদুর সাহেব অবাক বিস্ময়ে তাকালেন শামীমার প্রতি। তারপর বললেন, তোমার খোঁজে ছেলে আছে? কে সে ছেলে? তার পরিচয় কি?
শামীমা বলল, আপনি তাকে চিনবেন। পাত্র হিসেবে ছেলে এ যুগে বিরল। চেহারা-সুরত এবং শিক্ষা-দীক্ষায় ভাল। শাহিদার সাথে সুন্দর মানাবে। বংশ মর্যাদাও সমতুল্য। তবে একদিকে ছেলে বর্তমানে দুর্বল, ভবিষ্যতে সবল হবার

সম্ভাবনা উজ্জ্বল. সে দিকটা হলো আর্থিক দিক। ছেলে মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান।

অর্থ-সম্পদ তো চরিত্র ও সভ্যতার মাপকাঠি নয় মা। তুমি বলো. ছেলে যদি ভদ্র পরিবারের সুশিক্ষিত হয়. আর যদি সম্পদের পাহাড় তার নাও থাকে আমার কোন আপত্তি থাকবে না।

আলহামদুলিল্লাহ। ছেলে আমাদের হাতেই আছে আব্বা।

আমাদের হাতে?

হ্যাঁ, শামীমা একবার রকিব ও শাহিনা বেগমের দিকে তাকাল। সকলেই শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় বসে আছে শামীমার শেষ কথা শুনে খান বাহাদুর সাহেবের প্রতিক্রিয়া কি হয় তা দেখার জন্য। সকলেরই বুক ডিব্ ডিব্ করে কাঁপছে। শামীমার কথার পৃষ্ঠে খান বাহাদুর সাহেবের আশ্বাস বাণী থাকলেও তিনি যখন শুনবেন তারই অধীনস্ত এক বেতনভুক্ত কর্মচারির সাথে তার একমাত্র কন্যার বিয়ের প্রস্তাব করছে তারই ছেলের বৌ তখন তিনি ব্যাপারটা কিভাবে নেবেন, নাকি তার জমিদারী রক্ত টগবগিয়ে উঠবে তা দেখার জন্য সবাই উদগ্রীব হয়ে প্রহর গুনছে। শামীমা কিছুটা দ্বিধান্বিত কণ্ঠে বলল, হ্যাঁ মানে আমি হাসান ভাইজানের কথা বলছি আব্বা।

অনেকক্ষণ আনমনা থাকার পর হঠাৎ চমক ভাঙলে মানুষের যে অবস্থা হয়, খান বাহাদুর সাহেবেরও সেই অবস্থা হলো। তিনি মাথা তুলে তাকালেন শামীমার দিকে। শামীমা সে দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে শংকিত হয়ে মাটির দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে নিল। অন্যদেরও দম বন্ধ হবার উপক্রম হলো। শাহিদা বাইরে দাঁড়িয়ে দোয়া দরূদ পড়া শুরু করল। বেশ কিছুক্ষণ কাটল এভাবে। তারপর ধীরে ধীরে যেমন মেঘ কেটে যাবার পর সূর্যের কিরণ দেখা যায়, তেমনি ভাবে খান বাহাদুর রফিক আহমেদের ঠোঁটের কোণে এক টুকরো মিষ্টি হাসির ঝলক দেখা গেল। তিনি উপস্থিত সকলকে লক্ষ্য করে বললেন, আজ থেকে আমার এই মাকে আমি তার ছেলের উপদেষ্টা নিয়োগ করলাম, তোমরা সকলে তার নির্দেশ মেনে চলবে। এবার সকলের মুখেই হাসি ফুটে উঠল। শাহিদা শোনামাত্র দৌড়ে ঘরে গিয়ে ঢুকল। শামীমা খান বাহাদুরের কথার জবাবে হেসে উঠে বলল, ছেলে মাকে উপদেষ্টা নিয়োগ করে না আব্বা, মা তার পদাধিকার বলে উপদেষ্টা হয়েই থাকে। বলেই সে দৌড়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। খান বাহাদুর সাহেব হেসে

উঠে বললেন, এই বেটির সাথে কথায় আমি কোন দিনই পারলাম না। ওদিকে শামীমা ঘর থেকে বের হয়ে সোজা শাহিদার ঘরে গিয়ে ঢুকল–
–শাহিদা শামীমাকে দেখেই আবেগে-আনন্দে তাকে জড়িয়ে ধরতে অগ্রসর হলো, কিন্তু শামীমা বাধা দিয়ে বলল, দাঁড়াও, তোমার সাথে আমার কিছু কথা আছে। আব্বা তোমাদের বিয়েতে অনুমতি দিয়েছেন এজন্যেই আনন্দে আপ্লুত হবার কিছু নেই, আসল অনুমতির মালিক যিনি তিনি তোমাদের কবুল করবেন কিনা সেটাই বড় কথা!
–তার মানে, তুমি কার কথা বলছ ভাবী?
–বুঝতে পারনি? তোমাদের ভবিষ্যতের সুখ, শান্তি ও হিফাজতের যিনি মালিক সেই করুণাময় আল্লাহর কথাই আমি বলছি।
– তিনি কবুল করবেন না কেন?
– কেন করবেন না, একথাটা আমার আগেই বলা উচিত ছিল, কিন্তু আমি যখন তোমাদের ব্যাপারটা জানতে পারলাম তখন তোমরা অনেক পথ এগিয়ে গেছো। তাই বলিনি, বললে ব্যাথা পেতে এবং আমাকে ভুল বুঝতে। তাছাড়া তোমরা সীমালংঘন করনি, সীমালংঘন করলে তোমাকে বলতেই হতো। শোন শাহিদা, তোমরা যে পথে পা বাড়িয়ে এ পর্যন্ত উপনীত হয়েছো ইসলামী শরীয়ত মতে এ পথ সম্পূর্ণ অবৈধ। যদিও মানবিক দুর্বলতার কারণেই ঘটনাটি ঘটেছে তবু তোমরা অন্যায় করেছো। কারণ মানবিক দুর্বলতাকে দমন করার জন্যই ইসলামে অবাধ মেলামেশা নিষিদ্ধ করে আল্লাহপাক পর্দার বিধান জারি করেছেন, অন্যথায় পর্দার বিধান জারি করার কোন দরকার ছিল না। এই অবাধ মেলামেশা নারী-পুরুষের জন্য কত ভয়ংকর তোমার ভাইজানই তার বাস্তব দৃষ্টান্ত। বেপর্দা হয়ে একজন যুবতী মেয়ের উচিত নয় কোন পর পুরুষের সান্নিধ্যে গিয়ে লেখাপড়া করা। অবশ্য এখানে তোমার হাত ছিল না, তবে মা ইচ্ছা করলে একজন মহিলা শিক্ষিকা তোমার জন্য নিয়োগ করতে পারতেন। আব্বা তোমাদের গোপন ব্যাপারটা জানেন না, তাই সহজেই এ বিয়েতে মত দিয়েছেন। কিন্তু তিনি যদি জানতেন তোমরা পূর্বে থেকেই প্রেমে আসক্ত তাহলে কখনোই এ বিয়ে হতো না, ঘটনা ভিন্ন দিকে মোড় নিত, তখন কি করতে?
শামীমার কথাগুলো শাহিদা এক ধ্যানে শুনল, তারপর শামীমা থামলে, শাহিদা

অপরাধীর মত মাথা নত করে বলল. ভাবী সত্যি আমি ভুল করেছি। তোমার কথা শুনে নিজেকে বড় অপরাধী মনে হচ্ছে। কিন্তু এখন তো ভুল সংশোধনের কোন পথ নেই।

– কে বলেছে পথ নেই? ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হয়ে অনুশোচনার মাধ্যমে তওবা করে তাঁর কাছে ক্ষমা চাও, বান্দার প্রতি আল্লাহ্ অশেষ দয়াবান ও ক্ষমাসীন।

– ভাবী, আমি জানি তুমি আল্লাহর একজন নেক্কার প্রিয় বান্দী, তুমি দোয়া কর, যতদিন বাঁচব আল্লাহর সব বিধান মেনে যেন চলতে পারি। শাহিদার কথা শুনে শামীমা খুশী হয়ে বলল, ভুল করে ভুল বুঝতে পারার নামই তওবা। আমি নিশ্চয়ই দোয়া করব, মুসলমান ঘরের প্রতিটি মেয়ের মধ্যেই তোমার মত বুঝ পয়দা হোক এবং তোমার মত অনুতপ্ত হয়ে অনুশোচনার পূর্বে আল্লাহ্ তাদের সতর্ক হবার তাওফিক দান করুন। দাও, এখনি আমার ওকালতির বকশিশ বের কর। শামীমা হাসতে হাসতে শাহিদার দিকে হাত বাড়াল। শাহিদা শামীমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, তোমার বকশিশ তো আমি নিজেই। ওমা! তোমার দিয়ে আমি কি করব? হেসে বলল শামীমা, শাহিদা আরো জোরে তার ভাবীকে জড়িয়ে ধরে বলল, তোমার পা ধুইয়ে নিও।

✡ সমাপ্ত ✡

✡✡✡✡✡✡

আস্‌সালাতু খাইরুম মিনান্নাউম।' নিদ্রার চেয়ে নামায শ্রেষ্ঠ। আযানের সুমধুর এ শব্দ কানে যাওয়ার সাথে সাথে শাহিদার ঘুম ভেঙ্গে যায়। অতি আধুনিকতার দংশনে ক্ষয়ে যাওয়া বিশ্ব সংসারে শিক্ষা-দীক্ষায় মানুষ যত বেশী উন্নত হচ্ছে, সভ্যতার গন্ডি এবং নৈতিকতার সীমানা পেরিয়ে ততই দূরে ছিটকে পড়ছে। অপসংস্কৃতির সয়লাবে মুসলমান ঘরের ছেলে-মেয়েরা ক্রমশঃই নৈতিক চরিত্র হারিয়ে ফেলছে।

শশুর-শাশুড়ী-স্বামী এবং দেবর-ননদের ঘরে 'আদর্শ এক গৃহবধূ'র মূর্ত প্রতীক শামীমা। যে ফজরের নামায শেষ করে কুরআন তেলোয়াত করতে বসে।

অন্যদিকে আধুনিকতা এবং প্রগতির বেলেল্লাপনাকে ভদ্র ও মার্জিত ভেবে স্বতী-সাধ্বী নিজ স্ত্রীকেই গেঁয়ো প্রতিক্রিয়াশীল ভেবে মাকাল ফলের দিকে পা বাড়ায় রকিব। স্বাধীনতার নামে উচ্ছৃঙ্খল জীবন-যাপনে অভ্যস্ত সুন্দরী পারভীনের অন্ধ মোহে পড়ে সে। এদিকে আল্লাহর প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস আর ঈমানের কঠিন পরীক্ষায় ভয়ঙ্কর যন্ত্রনার মধ্যে থেকেও স্বামীর অবহেলার নরকানলে পুড়ে আরো খাঁটি হয়ে উঠে শামীমা।

একটি নিস্পাপ অক্ষত সজিব গোলাপ, অন্যটি হাজারো কীটে দংশিত বৃন্তচ্যুত বেলীফুল, শামীমার সাথে পারভীনের তুলনা চলে ঠিক এভাবেই।

এক সময় রকিবেরও মোহ ভঙ্গ হয়। এ যেন গন্দম খাওয়ার অপরাধে জান্নাত থেকে দুনিয়া অবতরণ বৈকি! খান বাহাদুর রফিক আহমেদ ও শাহীনা বেগমের মেয়ে শাহিদা এবং হাসানের মধ্যে গড়ে উঠা ভালবাসাও একদিন বিবাহে পূর্ণতা পায়। তবে অবাধ মেলামেশা নারী-পুরুষের জন্য কতটা ভয়ঙ্কর তার জ্বলন্ত প্রমাণ রকিব।

ব্যথিত হৃদয়ে অনুভব করে নারী অবলা। তারা বন্দি পুরুষের স্বীকৃতির শৃঙ্খলে। অথচ বেপর্দার পরিণতিতে একটি সাজানো বাগান আগুনে পুড়তে বসেছিল। অনুতপ্ত আর অনুশোচনায় বেপর্দার সে আগুন নেভানো যায় না। না পাওয়ার দুঃখটুকু বিয়োগ করে, পাওয়ার সুখটুকু আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চেয়েছে শামীমা। পরাজয়ের মধ্যে থেকেই জয়ী হয়েছে সে। নারী জাতির শ্রেষ্ঠ স্বীকৃতি আদর্শ এক গৃহবধূ'র সার্থকতা আসলে কোথায়?